

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رُجُوعُهَا وَ  
يَوْمَ تُسْفَرُهَا وَسُودَ عَهَا كُلِّ فِي رَبِّكَ مُبِينٌ ۝ وَ  
هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ  
عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَعْمَلُ وَعَلَىٰ قُلُوبِكُمْ  
إِنَّكُمْ مَعْرُوفُونَ ۝ مَنْ بَعَدَ الْمَوْتَ لَيَقُولُنَّ الْكَافِرُونَ  
هَذَا الْأَجْرُ مُبِينٌ ۝ وَلَيْسَ أَخْرَأَعْتَهُمُ الْعَذَابُ إِلَّا الْقَوْمَ  
مُتَعَدِّدَةً لَيَقُولُنَّ مَا جَسَدْنَا آلِهَةً مِنَّا يُمْسِكُ بِهَا  
عَنَّا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ ۝ وَلَيْسَ لِذُنُوبِكُمْ  
الْإِنْسَانُ وَمَنَاصِبَهُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنَّا إِنَّهُ لَيُؤَسُّوْنَ  
وَلَيْسَ أَذُنُهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَهْزِئَةٍ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ  
النَّيِّبَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَكَرِيمٌ فَخَوَّزَ إِلَّا الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝  
فَلَمَّا ك تَارَكَ بَعْضَ مَا يُوعَىٰ إِلَيْكَ وَضَاقَتْ بِهِ  
صَدْرُكَ إِنَّ يَاقُونَ لَوَالِئِلَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كَذْرَٰءَ جَاءَ مَعَهُ  
مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

(১) আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার  
বিষয়ে আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং  
কোথায় সমাপিত হয়। সব কিছুই এক সুনিয়ন্ত্রিত কিতাবে রয়েছে। (৭)  
তিনিই আসমান ও যমীন ছয় দিনে তৈরী করেছেন, তাঁর আরাশ ছিল  
পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের  
কিন্তু কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আর যদি আপনি তাদেরকে  
জানেন যে, “নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত উঠানো হবে,  
তখন কাকেররা অবশ্য বলে এটা তো সম্প্রদায়। (৮) আর যদি আমি  
এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তাদের আযাব স্থগিত রাখি, তাহলে তারা  
শ্রদ্ধাশীল হবে কেন জিনিসে আযাব ঠেকিয়ে রাখছে? শুনে রাখ,  
যেদিন তাদের উপর আযাব এসে পড়বে, সেদিন কিন্তু তা ফিরে  
হওয়ার নয়, তারা যে ব্যাপারে উপহাস করত তাই তাদেরকে ঘিরে  
কেনাবে। (৯) আর অবশ্যই যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের  
আঘাত গ্রহণ করতে দেই, অতঃপর তা তার থেকে ছিনিয়ে নেই  
অহলে সে হতাশ ও কৃতব্র হয়। (১০) আর যদি তার উপর আপত্তি  
কৃত্য-কষ্টের পরে তাকে সুখভোগ করতে দেই, তবে সে বলতে থাকে  
যে, আমার অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে, আর সে আনন্দে আত্মহারা হয়,  
অন্ধকারে উদ্ধৃত হয়ে পড়ে। (১১) তবে যারা ঐশ্বর্যধারণ করেছে এবং  
সকলকে করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে। (১২)  
আর সম্ভবতঃ ঐসব আত্মকা ম যা গুহীর মাধ্যমে তোমার নিকট পাঠানো  
হয়, তার কিছু অংশ বর্জন করবে? এবং এতে মন ছোট করে বসবে?  
আমাদের এ কথায় যে, তাঁর উপর কোন ধন-ভান্ডার কেন অবতীর্ণ  
হয়নি? অথবা তাঁর সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন? তুমিতো  
শু শু সতর্ককারী মাত্র; আর সব কিছুই দায়িত্বভার তো আল্লাহই  
নিয়ন্ত্রণ করেন।

১২১ (দাব্বাতুন) এমনসব প্রাণীকে বলে যা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে।  
পক্ষীকুলও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, খাদ্য গ্রহণের জন্য তারা ভূ-পৃষ্ঠে  
অবতরণ করে থাকে এবং তাদের বাসস্থান ভূ-পৃষ্ঠে সলিল হয়ে থাকে।  
সামুদ্রিক প্রাণীসমূহও পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল। কেননা,  
সাগর-মহাসাগরের তলদেশেও মাটির অস্তিত্ব রয়েছে। মোটকথা, সমুদ্র  
প্রাণীকুলের রিমিকের দায়িত্বই তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন এবং একথা  
এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যাদ্বারা দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা যায়।  
এরশাদ করেছেন 'عَلَى اللَّهِ رُجُوعُهَا' তাদের রিমিকের দায়িত্ব আল্লাহর  
উপর ন্যস্ত। একথা সম্প্রদায় যে, আল্লাহ তাআলার উপর এহেন গুরুদায়িত্ব  
চাপিয়ে দেয়ার মত কোন ব্যক্তি বা শক্তি নেই, বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ  
করে গ্রহণ করে আমাদেরকে আশুস্ত করেছেন। আর এক পরম সত্য,  
দাতা ও সর্বশক্তিমান সত্তার গুণাদা যাতে নড়চড় হওয়ার অবকাশ নেই।  
সুতরাং নিশ্চয়তা বিধান করণার্থ এখানে على শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা ফরয  
বা অবশ্যকরণীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অথচ আল্লাহর উপর কোন  
কাজ ফরয বা গুণাজিব হতে পারে না, তিনি কারো হুকুমের তোয়াক্বা  
করেন না।

১২২ রিমিকের আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু যা কোন প্রাণী আহার্যরূপে  
গ্রহণ করে, যার দ্বারা সে দৈহিক শক্তি সঞ্চয়, প্রবৃদ্ধি সাধন এবং জীবন  
রক্ষা করে থাকে। রিমিকের জন্য মালিকানা স্বত্ব শর্ত নয়। সকল  
জীব-জন্তু রিমিক ভোগ করে থাকে কিন্তু তারা তার মালিক হয় না।  
কারণ, মালিক হওয়ার যোগ্যতাই গুণের নেই। অনুরূপভাবে ছোট  
শিশুরাও মালিক নয়, কিন্তু গুণের রিমিক অব্যাহতভাবে তাদের কাছে  
পৌছতে থাকে। রিমিকের এহেন ব্যাপক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে  
গুলামায়ে কেলাম বলেন, রিমিক হাললও হতে পারে, হারামও হতে পারে।  
যখন কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে অন্যের মাল হস্তগত ও উপভোগ করে,  
তখন উক্ত বস্তু তার রিমিক হওয়া স্যাব্যস্ত হয়, তবে অবৈধ পন্থা অবলম্বন  
করার কারণে তা তার জন্য হারাম হয়েছে। যদি সে লোভের বশবর্তী হয়ে  
অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করত, তাহলে তার জন্য নির্ধারিত রিমিক  
বৈধপন্থায়ই তার নিকট পৌছে যেত।

১২৩ রিমিক সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : এখানে প্রশ্ন হতে  
পারে যে, প্রতিটি প্রাণীর জিবিকার দায়িত্ব থেকেই আল্লাহ তাআলা খোদ  
গ্রহণ করেছেন, কাজেই অনাহারে কারো মৃত্যুবরণ করার কথাই নয়।  
অথচ বাস্তবে দেখা যায়, অনেক প্রাণী ও মানুষ খাদ্যের অভাবে, অনাহারে  
ক্ষুধা-পিপাসায় মারা যায়, এর রহস্য কি? গুলামায়ে কেলাম এ প্রশ্নের  
বিভিন্নভাবে জবাব দিয়েছেন।

তন্মধ্যে একটি জবাব হচ্ছে, এখানে রিমিকের দায়িত্ব গ্রহণের অর্থ হবে  
আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আল্লাহ  
তাআলা রিমিকের দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ করেন। আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া মাত্র তাকে  
মৃত্যুবরণ করে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিদায় নিতে হবে। সাধারণত বিভিন্ন  
রোগ-ব্যধির কারণে মৃত্যু হলেও কখনো কখনো অগ্নিদগ্ন হওয়া, সলিল  
সমাধি লাভ করা, আঘাত বা দুর্ঘটনায় পতিত হওয়াও এর কারণ হয়ে  
থাকে। অনুরূপভাবে রিমিক বন্ধ করে দেয়ার কারণে অনাহারও মৃত্যুর  
কারণ হতে পারে। কাজেই, আমরা যাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে  
দেখি, আসলে তাদের রিমিক ও আয়ু শেষ হয়ে গেছে, অতঃপর

রোগ-ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি না ঘটিয়ে বরং রিযিক সরবরাহ বন্ধ হওয়ার কারণে অনাহার ও ক্ষুধা-পিপাসায় তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।

ইমাম কুরতুবী (রাঃ) অত্র আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবু মুসা (রাঃ) ও হযরত আবু মালেক (রাঃ) প্রমুখ আশআরী গোত্রের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে, তারা ইয়ামন হতে হিজরত করে মদীনা শরীফ পৌঁছলেন। তাঁদের সাথে পাথের স্বরূপ আহাৰ্য পানীয় যা ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে গেলে তারা নিজেদের পক্ষ হতে একজন মুখপাত্র হযরত (সাঃ)-এর সমীপে প্রেরণ করলেন যেন রসুলে করীম (সাঃ) তাদের জন্য কোন আহাৰ্যের সু-ব্যবস্থা করেন। উক্ত প্রতিনিধি যখন রসুলে আকরাম (সাঃ)-এর গৃহদ্বারে হাযির হলেন, তখন গৃহাভ্যন্তর হতে রসুলে পাক (সাঃ)-এর কোরআন তোলাওয়াতের সুমধুর ধ্বনি ভেসে এল وَمَا مِنْ

ذَابِقِي الْأَرْضِ أَلَعَلَّ اللَّهُ يَرْزُقُهَا পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেননি। সাহাবী অত্র আয়াত শ্রবণ করে মনে করলেন যে, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং যখন খাবতীয় প্রাণীকুলের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমরা আশআরী গোত্রের লোকেরা আল্লাহ তাআলার নিকট নিশ্চয় অন্যান্য জস্ত-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট নই, অতএব তিনি অবশ্যই আমাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। এ ধারণা করে তিনি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিজেদের অসুবিধার কথা না বলেই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ফিরে গিয়ে স্বীয় সাথীদের বললেন—“শুভ-সংবাদ, তোমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য আসছে।” তারা এ কথার অর্থ বুঝলেন যে, তাঁদের মুখপাত্র নিজেদের দুরবস্থার কথা রসুলে পাক (সাঃ)-কে অবহিত করার পর তিনি তাঁদের আহাৰ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করার আশাস দান করেছেন। তাই তাঁরা নিশ্চয় মনে বসে রইলেন। তারা উপবিষ্টই ছিলেন, এমন সময় দুই ব্যক্তি গোশত-রুটিপূর্ণ একটি قِصْعَةً অর্থাৎ, বড় খাঙ্কা বহন করে উপস্থিত হয়ে আশআরীদের দান করল। অতঃপর দেখা গেল আশআরী গোত্রের লোকদের আহাৰ্য করার পরও প্রচুর রুটি-গোশত রয়ে গেল। তখন তাঁরা পরামর্শ করে অবশিষ্ট খানা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমীপে প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন, যেন তিনি প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করতে পারেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা নিজেদের দুই ব্যক্তির মাধ্যমে তা রসুলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন।

তারা খাঙ্কা নিয়ে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন—“ইয়া রসুলুল্লাহ (সাঃ), আপনার শ্রেষ্ঠ রুটি-গোশত অত্যন্ত সুখাদ্য ও উপাদেয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়েছে।” তদুত্তরে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “আমি তো কোন খাদ্য প্রেরণ করিনি।”

তখন তাঁরা পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, আমাদের অসুবিধার কথা আপনার কাছে ব্যক্ত করার জন্য অমুক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি ফিরে গিয়ে একথা বলেছিলেন। ফলে আমরা মনে করেছি যে, আপনিই খানা প্রেরণ করেছেন। এতদশ্রবণে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন—“আমি নই বরং ঐ পবিত্র সত্তা প্রেরণ করেছেন যিনি সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।”

আলোচ্য আয়াতসমূহে রসুলে করীম (সাঃ)-এর রেসালতের সত্যতা এবং এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের জবাব দেয়া হয়েছে। ৯ম থেকে তিন আয়াতে মানুষের একটি স্বভাবজাত বদভ্যাসের বর্ণনা এবং উহা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৯ম ও ১০ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ জন্মগতভাবে ঢাল প্রকৃতির ও ক্ষিপ্ততাবাদী। এতদসঙ্গে মানুষের বর্তমান নিয়ে বিভোর হতে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। একজন করেছেন, আমি মানুষকে আমার কোন নেয়ামতের স্বাদ-আবাদন করার পর যদি তা ছিনিয়ে নেই, তবে তারা একেবারে হিম্মত-হারা, হতাশ ও না-শোকর হয়ে যায়। আর তার উপর দুঃখ-দুর্দশা আপতিত হওয়ার পর, যদি তা দূরীভূত করে সুখ-শান্তি দান করি, তাহলে তারা অন্য আত্মহারা হয়ে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল চিরতরে দূরীভূত হয়ে গেছে।

সারকথা এই যে, মানুষ স্বভাবতঃ ক্ষিপ্ততাবাদী বর্তমান অবস্থাকে তারা সর্বস্ব মনে করে থাকে। অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থা এবং ইতিহাস স্মরণ রেখে এবং চিন্তা করে শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা অত্যন্ত না। কাজেই, সুখ-সমৃদ্ধির পর দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়া মাত্র অতীত নেয়ামতরাজির প্রতি নিমকহারামী করে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। যে মহান সত্তা প্রথমে সুখ-সচ্ছলতা দান করেছিলেন, তিনি যে আবারও তা দিতে পারেন সে কথা তারা খেয়ালই করে না। অনুরপভাবে দুঃখ-দৈন্যের পরে যদি সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে, তখন পূর্বাবস্থা স্মরণ করে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করার পরিবর্তে হঠকারিতা ও অহয়্য করতে থাকে। অতীতকে বিস্মৃত হয়ে তারা মনে করতে থাকে যে, এস সুখ-সম্পদ আমারই যোগ্যতার পুরস্কার এবং অব্যাহতাবী প্রাপ্য। এক কখনো আমার হাতছাড়া হবে না। আত্মভোলা মানুষ এ কথা চিন্তা করেন যে, পূর্ববর্তী দুঃখ-দুর্দশা যেমন স্থায়ী হয়নি, তদ্রূপ বর্তমান সুখ-স্বাস্থ্য চিরস্থায়ী নাও হতে পারে।

১১ তম আয়াতে এমনি ইনসানে-কামেল বা সত্যিকার মানুষকে সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা হতে পৃথক করার জন্য এরশাদ করেছেন اَلَا الْاِنْسَانُ صَادِقًا وَعَبْدًا لِلْاٰلِهٰتِ অর্থাৎ, সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা উর্ধ্ব এসব ব্যক্তি যাদের মধ্যে দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে। একটি হচ্ছে ধৈর্য ও সহনশীলতা, দ্বিতীয়টি সংকম্পশীলতা।

সবর শব্দটি বাংলা ও উর্দুর চেয়ে আরবী ভাষায় অনেক ব্যাপকতর অর্থ ব্যবহৃত হয়। সবরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাধা দেয়া, বন্ধন করা। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় অন্যান্য কার্য হতে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করাকে ‘সবর’ বলে। সুতরাং শরীয়তের পরিপন্থী যাবতীয় পাপকার্য হতে প্রবৃত্তিকে দমন করা যেমন সবরের অন্তর্ভুক্ত, তদ্রূপ ক্ষয়, ওয়াজিব, সুনুত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি নেক কাজের জন্য প্রবৃত্তিকে ব্যা করাও সবরের শামিল। সারকথা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সাঃ)-এ প্রতি পূর্ণ ঈমান ও রোজ কেয়ামতের জবাবদিহির ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ ও রসুলের অপসন্দনীয় কার্যকলাপ হতে দূরে থাকে এবং সন্তোষজনক কার্য মশগুল থাকে, তারাই পূর্ণ ঈমানদার ও সত্যিকার মানুষ নামের যোগ্য। অত্র আয়াতেরই শেষ বাক্যে ধৈর্য ধারণকারী, সংকম্পশীল, পূর্ণ ঈমানদারগণের প্রতিদান ও পুরস্কারের কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে اَلَّذِي لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاجْرٌ كَبِيرٌ অর্থাৎ, তাদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে তাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে এবং তাদের সংকাম্যসমূহে বিরাট প্রতিদান দেয়া হবে।

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, পার্থিব সুখ-দুঃখ উভয়কে আল্লাহ তাআলা اَلَّذِي “স্বাদ আবাদন করাই” বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ সুখ-দুঃখ পরকালে হবে। পৃথিবীতে পুরোপুরি সুখ বা দুঃখ নেই। বর

(৬) দায়িত্ব কোষ তিনি পানি দিয়ে যখন বলেন তখন এক নিশ্চয় বেদিত যোগ্য কেন্দ্র আত্ম জাহ দুঃখ-বে, অহং স্বক-আর হস্ত, তাহা হস্ত-শু নিয়ে

পক্ষে স্বাদ গ্রহণের জন্য নমুনাধরূপ যৎকিঞ্চিৎ সুখ-দুঃখ দেয়া যেন, আখেরাতের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে সুভার পান্থিক সুখ-শান্তিতে আনন্দে আত্মহারা হওয়া যেমন তদ্রূপ পান্থিক দুঃখ-দুর্শিও অত্যধিক বিমর্ষ হওয়ার বিষয় নয়। দুনিয়াকে আধুনিক পরিভাষা অনুসারে আখেরাতের একটা ধরূপ বলা যেতে পারে। যেখানে আখেরাতের সুখ-দুঃখের নুমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে আয়াত এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তা মকার মুশরিকরা মহানবী (সাঃ) সমীপে কতিপয় আবদার পেশ করিল। প্রথমতঃ তারা বলল, এতে আমাদের দেব-দেবীকে নিন্দা করা তাই আমরা এর প্রতি ঈমান আনতে পারছি না। অতএব, আপনি অন্য কোরআন নিয়ে আসুন অথবা এর মধ্যে পরিবর্তন ও সংশোধন করুন। **أَيُّ مَثَلٍ لِّمَنْ كَفَرَ بِآيَاتِنَا أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا سَوَّاهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ آلِهِمْ كَذِبٌ بَلَّغٌ لِلنَّاسِ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ** আপনি অন্য কোরআন নিয়ে আসুন এগুলো পরিবর্তন করুন।—(তফসীরেবগবী ও তফসীরে সূরী)।

দ্বিতীয়তঃ তারা আরো বলেছিল যে, “আমরা আপনার নবুওয়তের তখন বিশ্বাস স্থাপন করব, যখন দেখব যে, দুনিয়ার বাদশাহদের মত আপনার আয়ত্তে কোন ধন-ভান্ডার রয়েছে এবং কোন থেকে আপনি সবাইকে দান করেছেন। অথবা, আসমান হতে কোন ক্ষমতা অবতরণ করে আপনার সাথে সাথে থাকবেন এবং আপনার সমর্থন করে বলবে যে, ইনি সত্যিই আল্লাহর রসূল।”

তাদের এহেন অবাস্তব ও অযৌক্তিক আবদার শুনে রসূলে করীম (সাঃ) মনঃক্ষুব্ধ হলেন। কারণ, তাদের অযৌক্তিক আবদার পূরণ করা কোন তাঁর এখতিয়ার বহির্ভূত ছিল, তদ্রূপ তাদেরকে কুফরী ও শেরকের দ্বারা ছেড়ে দেয়াও অসহনীয় ছিল, তাদের হেদায়েতের চিন্তা-ফিকির দূর হতে দূর করাও সম্ভবপর ছিল না। কেননা, রাহমাতুল-লিল-আলামীন বা সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমতস্বরূপ তিনি অবতরণ করছিলেন।

তাদের আবদার ছিল নিরৈত মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতা-প্রসূত। কেননা, সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অসার মূর্তিপূজা ও অন্যান্য নিন্দনীয় কার্য-কলাপের সমালোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়তঃ নবুওয়তকে তারা বাদশাহীর সাথে তুলনা করেছিল। আসলে বাদশাহদের সাথে নবুওয়তের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। অপরদিকে আল্লাহ তাআলারও এমন কোন রীতি নেই যে, তিনি বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে মানুষকে দায়ে ঠেকিয়ে ঈমান আনতে বাধ্য করবেন। তাই যদি হতো, তবে নিখিল সৃষ্টিজগত তাঁর অপার কুদরতের আওতায়ই রয়েছে। কিন্তু সত্য ছিল যে, তাঁর অপছন্দনীয় কোন কাজ করবে বা চিন্তাধারা পালন করবে? কিন্তু তাঁর অফুরন্ত হেকমতের তাগিদে ইহ-জগতকে সঠিকাক্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন। এখানে সংকার্য সম্পাদন অথবা, অন্যায়-অসত্য থেকে বিরত রাখার জন্য বৈষয়িক দিক থেকে কাউকে

বাধ্য করা হয় না।

তবে যুগে যুগে পয়গম্বর প্রেরণ ও আসমানী কিতাব নাযিল করে ভাল-মন্দে পান্থিক এবং তার প্রতিকূল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। সংকার্য করা ও অসংকার্য থেকে দূরে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর মুজ্জাযরূপ সাথে সাথে যদি কোন ফেরেশতা থাকতেন, তবে যখনই কেউ তাঁকে অমান্য করত, তৎক্ষণাৎ গর্ষবে পতিত হয়ে ধ্বংস হত। ফলে তা দায়ে ঠেকে ঈমান আনার পথায়তুক্ত হত। তাছাড়া ফেরেশতার সাক্ষ্যদানের পর ঈমান আনা হলে তা ঈমান বিল-গায়ব বা গায়বের প্রতি ঈমান হত না। অথচ ঈমান বিল-গায়বই হচ্ছে ঈমানের মূল প্রাণশক্তি। আর ঈমান না আনার এখতিয়ারও থাকত না। অথচ এই এখতিয়ারের উপরই যাবতীয় আমলের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমীপে তাদের এহেন অধীন আবদার প্রমাণ করে, তারা নবী ও রসূলের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ ও জাহেল ছিল। তারা আল্লাহ তাআলা ও রসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে না; বরং আল্লাহর ন্যায় রসূলেও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। তাই রসূলের কাছে তারা এমন আবদার করেছে যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না।

যাহোক, রসূলে করীম (সাঃ) তাদের এহেন অবাস্তব আবদারে অত্যন্ত দুঃখিত ও মনঃক্ষুব্ধ হলেন। তখন তাঁকে সাধুনা দান ও মুশরেকদের শাস্ত ধারণা নিরসনের জন্য অত্র আয়াত অবতীর্ণ হল।

যাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি কি তাদের কথায় হতোদ্যম হয়ে আল্লাহর প্রেরিত কোরআন পাকের কোন কোন আয়াত প্রচার করা ছেড়ে দেবেন, যার মধ্যে মুর্তির অসারতা ও অক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে বলে মুশরেকরা ঐ সব আয়াত অপছন্দ করছে? এখানে **لَعَلَّكُمْ** শব্দ এজন্য প্রয়োগ করা হয়নি যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন কোন আয়াত বাদ দেবেন বলে ধারণা করার অবকাশ ছিল। বরং এখানে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, মুশরেকদের মনোরঞ্জনের খাতিরে রসূলে পাক (সাঃ) কোরআন করীমের কোন আয়াত গোপন রাখতে পারেন না। কারণ, তিনি তো আল্লাহর পক্ষ হতে **نَزِيرٌ** ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরিত হয়েছেন। সর্ব কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই গ্রহণ করেছেন। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখনই নবীর মাধ্যমে মুজ্জায প্রদর্শন করেন। অতএব, তাদের অন্যান্য আবদারে আপনার মনঃক্ষুব্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

কাফের ও মুশরেকরা শুধু ভীতি প্রদর্শনের যোগ্য হওয়ার কারণে এখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে **نَزِيرٌ** নাযীর বলা হয়েছে। নতুবা তিনি একদিকে যেমন **نَزِيرٌ** (ভীতি প্রদর্শক) ছিলেন, অপরদিকে সংকম্পীলদের জন্য তদ্রূপ **بَشِيرٌ** সুসংবাদাতাও ছিলেন। অধিকন্তু ‘নাযীর’ এমন ব্যক্তিকে বলে যিনি স্নেহ-মমতার ভিত্তিতে স্বীয় প্রিয়জনকে অনিশ্চ ও ক্ষতিকর বস্তু হতে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করেন এবং রক্ষা করার চেষ্টা করেন। অতএব, নাযীর শব্দের মধ্যে ‘বশীর’—এর মর্মও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورٍ مِّثْلِهِ مَعْتَدِينَ ۝  
 ادْعُوا مَنِ اسْتَعْتَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝  
 فَأَلْهَمْنِي يَتَّبِعُوا أَمْرًا قَالُوا أَلَمْ يَأْتِزَلْ بِعِلْمِ اللَّهِ وَإِنَّ الْآلَةَ  
 الْأُولَىٰ قَهْلٌ أَنْتُمْ سُؤْلُونَ ۝ مَنْ كَانَ رَبِيدًا صَبُوءَ الْبُيُوتِ  
 رَبِيئَهَا لَوْ أَنَّ إِلَهُهُمْ أَعْبَأَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُجَسِّدُونَ ۝  
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَانُوا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا  
 صَنَعُوا فِيهَا وَيُطَلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ  
 بَيْتِنَا مِنْ دُونِهِ وَيَتَّوَعُّهُ شَاهِدًا مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ الْيُؤْتِي  
 إِمَامًا وَرِصَّةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ  
 الْأَحْزَابِ قَالُوا لَمَوْعِدَةٌ فَلَا تُكْفِرُ فِي مُرِيدَةٍ إِنَّهُ الْحَقُّ  
 مِنْ رَبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ  
 مِنْ أَقْدَمَىٰ عَلَى اللَّهِ كَيْنًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ  
 يَقُولُ الرَّشَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ آلَا  
 لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ  
 اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

(১৩) তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে। (১৪) অতঃপর তারা যদি তোমাদের কথা পূরণ করতে অপারগ হয়; তবে জেনে রাখ, এটি আল্লাহর এলম দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছে; আরো একীকরণ করে নাও যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। অতঃপর, এখন কি তোমরা আত্মসমর্পণ করবে? (১৫) যে ব্যক্তি পার্শ্ববর্তীকরণ ও তার চাকচিক্যই কাশনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। (১৬) এরাই হল সেসব লোক আশেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরদা করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল। (১৭) আচ্ছা বল তো, যে ব্যক্তি তার প্রভুর সুস্পষ্ট পথে রয়েছে, আর সাথে সাথে আল্লাহর তরফ থেকে একটি সাক্ষীও বর্তমান রয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী মুসা (আঃ)—এর কিভাবেও সাক্ষী যা ছিল পশ্চিমদিক ও রহস্য স্বরূপ, (তিনি কি অন্যান্যের সমান)? অতঃপর তাঁরা কোরআনের প্রতি ঈমান আনেন। আর ঐসব দলগুলির যে কেউ তা অস্বীকার করে, দোষণই হবে তার ঠিকানা। অতঃপর, আপনি তাতে কোন সন্দেহে থাকবেন না। নিঃসন্দেহে তা আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে ঋণ সত্য; তথাপি অনেকেই তা বিশ্বাস করে না। (১৮) আর তাদের চেয়ে বড় যালম কে হতে পারে, যারা আল্লাহর প্রতি মিত্যারোপ করে। এসব লোককে তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত সম্পূর্ণ করা হবে আর সাক্ষীগণ বলতে থাকবে, এরাই ঐসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখ, যালমদের উপর আল্লাহর অভিস্যপাত রয়েছে। (১৯) যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয়, আর তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায়, এরাই আশেরাতকে অস্বীকার করে।

আলোচ্য আয়াতে মুশরেকদের পক্ষ হতে বিশেষ ধরনের মু'জেযা বলি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হযরত (সাঃ)—এর মু'জেযা পাক—কোরআন তোমাদের সম্পূর্ণ রয়েছে, যার আলৌকিকত্ব তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমরা বলি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ মু'জেযার দাবী করে থাক, তাহলে কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের দাবী পূরণ করা হয়েছে। সূতরাং নতুন কোন মু'জেযা দাবী করার কোন অধিকার তোমাদের নেই। আর বলি ধৃষ্টতার কারণে তোমরা মু'জেযার দাবী করে থাক, তাহলে তোমাদের ক্ষত হঠকারী লোকেরা মু'জেযা দেখার পর ঈমান আনয়ন করবে এমন আশঙ্কা করা যায় না। সারকথা, কোরআন করীম যে এক স্পষ্ট ও স্থায়ী মু'জেযা, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ব্যাপারে কাকের ও মুশরেকেরা কোন অমূলক সন্দেহ—সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল পরবর্তী দুই আয়াতে তার জন্য এভাবে দেখা হয়েছে যে, তারা কি বলতে চায় যে, কোরআন মজীদ আল্লাহর কালাম নয়; বরং হযরত (সাঃ) স্বয়ং তা রচনা করেছেন? বলি তোমরা তাই মনে করে থাক যে, এরূপ বিস্ময়কর কালাম নবীয়ে-উস্বী (সাঃ) নিজে রচনা করেছেন, তাহলে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে দেখাও। আর একই ব্যক্তি দশটি সূরা তৈরী করতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। বরং সারা দুনিয়ার পন্ডিত, সাহিত্যিক, মানুষ ও জিন, তথা দেব-দেবী সবাই মিলেই তা রচনা করে আন। কিন্তু তারা কখন দশটি সূরাও তৈরী করতে পারছে না, তাই আপনি বলুন যে, ঐ কোরআন যদি কোন মানুষের রচিত কালাম হতো, তাহলে কখন মানুষেরাও অনুরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হত। সকলের অপারগ হওয়াই এর প্রকট প্রমাণ যে, এই কোরআন আল্লাহ পাকের এলম ও কুদরতে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। এর মাঝে বিন্দুবিসর্গ হ্রাস—বৃদ্ধি করারও অবকাশ নেই।

অত্র আয়াতে দশটি সূরা তৈরী করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। কিন্তু তা করতে যখন তারা অপারগ হল, তখন তাদের অক্ষমতা আরো প্রকটভাবে প্রমাণ করার জন্য কোরআন করীমের সূরা বাক্বারার আয়াতে মাত্র একটি সূরা তৈরী করার চ্যালেঞ্জ করা অর্থাৎ, তোমরা পরিষ্কার কোরআনকে যদি মানুষের তৈরী কালাম বলে মনে করে থাক, তাহলে তোমরা বেশী নয় অনুরূপ একটি সূরা তৈরী করে আন। কিন্তু তাদের জন্য এতটা সহজ করে দেয়া সত্ত্বেও কোরআন পাকের এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হল না। অতঃপর, কোরআন মজীদ আল্লাহ কালাম ও স্থায়ী মু'জেযা হওয়া সন্দেহহীন প্রমাণিত হল। তাই পরিশেষে বলা হয়েছে—**فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْتَمِدُونَ** অর্থাৎ, এখনও কি তোমরা মুসলমান ও আনুগত্যপরায়েণ হবে, নাকি সে গাফলতিতেই মজে থাকবে?

ইসলাম বিরোধীদের যখন আযাবের ভয় দেখানো হতো, তখন তারা নিজেদের দান-খয়রাত, জনসেবা ও জনহিতকর কার্যবলীকে সাফাইরূপে তুলে ধরত। তারা বলত যে, এতসব সংকার্য করা সত্ত্বেও আমাদের শান্তি হবে কেন? আঙ্গকাল পান্ডিত্যের দাবীদার অনেক অজ্ঞ মুসলমানকে এতই সন্দেহে পতিত দেখা যায়। বাস্তবিকদৃষ্টিতে যেসব অমুসলমান পণ্ডিতপ্রবান, ন্যায়পরায়েণ হয় এবং কোন রাস্তা, পুল, হ্রাসপাতাল, গদি সরবরাহ ইত্যাদি কোন জনকল্যাণকর কাজ করে, তাদেরকে মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। ১৫তম এ আয়াতে সে মনোভাবেরই জবাব দেয়া হয়েছে।



হযরত নূহ (আঃ) যখন তাঁর জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, তখন জাতি তাঁর নবুওয়ত ও রেসালতের উপর কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল। হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহর হুকুমে তাদের প্রতিটি উক্তি উপযুক্ত জবাব দান করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের একটি কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের ক্মূলনীতি ও মাসায়েলের তা'লীম দেয়া হয়েছে।

২৭ নং আয়াতে মুশরেকদের কতিপয় আপত্তি ও সন্দেহমূলক বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

হযরত নূহ (আঃ)-এর নবুওয়ত ও রেসালতের উপর তাদের প্রথম আপত্তি ছিল مَا تَزَكُّوا إِلَيْنَا إِنَّا لَا نَسْتَكْبِرُ آمরা তো দেখি যে আপনি আমাদের মতই মানুষ হা। আমাদের মত পানাহার করেন, হাট-বাথারে যাওয়াত করেন, নিদ্রা যান জাগ্রত হন, সবকিছু স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও আপনি নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রসূল ও বার্তাবাহক বলে যে অস্বাভাবিক দাবী ভুলছেন, তা আমরা কিরূপে মানতে পারি? তারা মনে করত যে, আল্লাহর পক্ষ হতে রসূলরূপে কোন মানুষের প্রেরিত হওয়া সমীচীন নয়, বরং ফেরেশতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন তাঁর বিশেষত্ব সফই ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য হয়।

২৮ নং আয়াতে ইহার জবাবে এরশাদ হয়েছে—

قَالَ لَقَوْمِ آرَيْدُكُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآسَأْتُمْ رَحْمَةً مِّن عِنْدِي فَعَيِّتْ عَلَيْهِمْ أَنْزِلُوا كُفُومَهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ হওয়া নবুওয়ত ও রেসালতের পরিপন্থী নয়। বরং চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, মানুষের নবী মানুষ হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। যেন মানুষ অনায়াসে তাঁর কাছে দ্বীন শিক্ষা করতে পারে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। মানুষ ও ফেরেশতের স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। যদি ফেরেশতকে নবী করে পাঠানো হত, তবে তাঁর কাছে ধর্মীয় আদর্শ শিক্ষা করা এবং তা পালন করা মানুষের জন্য দুষ্কর ও অসম্ভব হত। কেননা, ফেরেশতাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, নিদ্রা-তন্দ্রার প্রয়োজন হয় না, রিপূর তাড়না নেই, মানবীয় প্রয়োজনের সস্মুখীন হন না। অতএব, তাঁরা মানুষের দুর্বলতা উপলব্ধি করে যথাবিহিত তা'লীম দিতে পারতেন না এবং তাদের পূর্ণ তাবোদারী করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হত না। এ প্রসঙ্গটি পিঠি কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে বা ইশারা-ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি করার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ করলে তোমরাও অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবে যে, মানুষ আল্লাহর নবী হতে পারবে না—এমন কোন কথা নেই। তবে আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর কাছে এমন কোন অকাটা প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে— যা দেখে মানুষ সহজেই বোঝতে পারে যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর বা বার্তাবহ। সাধারণ লোকের জন্য নবীর মু'জ্জযাই তাঁর নবুওয়তের সত্যতার আকটা প্রমাণ। এজন্যই হযরত নূহ (আঃ) বলেছেন যে, আমি আল্লাহর তরফ হতে স্পষ্ট দলীল, অকাটা প্রমাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছি। সুকু'ভাবে চিন্তা-বিবেচনা করলে তোমরাও এটা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ তোমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও অন্ধ করেছে। তাই তোমরা অস্বীকার করে বসেছ এবং নিজেদের হঠকারণ

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ  
رَبٌّ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضَعِّفُ لَهُمُ الْعَذَابَ مَا كَانُوا  
يَسْتَعْجِلُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ  
خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ لَأَحْرَبُمْ  
أَنْتُمْ فِي الْأَخْرَافِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ ۝ مِثْلَ الْفَرْقَيْنِ مِثْلَ الْغُلَامِ وَالْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرِ  
وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مِثْلًا أَفَلَا تَنزِيلًا ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا  
نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا  
اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامِ فَقَالَ الْمَلَائِكَةُ  
لَهُ كَرِهْنَا وَإِنْ قَوْمِهِ مَتَارِكٌ إِلَّا أَكْثَرًا مِمَّنَّا وَمَا نَزَلْنَا  
إِلَيْكَ إِلَّا الْآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ ۝ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بِأَيْدِي الرِّبَايِ وَمَا نَزَلْنَا  
لَهُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ بَلْ نَنْظُرُهُمْ كَذِبِينَ ۝ قَالَ لَقَوْمِ آرَيْدُكُمْ  
إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآسَأْتُمْ رَحْمَةً مِّن عِنْدِي  
فَعَيِّتْ عَلَيْهِمْ أَنْزِلُوا كُفُومَهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ ۝

(২০) তারা পৃথিবীতেও আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই, তাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে; তারা শুনতে পারত না এবং দেখতেও পেত না। (২১) এরা সে লোক, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আর এরা যা কিছু মিথ্যা যা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল, তা সবই তাদের থেকে হারিয়ে গেছে। (২২) আশেরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত, কোন সন্দেহ নেই। (২৩) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং ধর্মীয় পালনকর্তার সমীপে বিনতি প্রকাশ করেছে তারাি বেহেশতবাসী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (২৪) উত্তরপক্ষের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন অন্ধ ও বধির এবং যে দেখতে পায় ও শুনতে পায় উভয়ের অবস্থা কি এক সমান? তবুও তোমরা কি ভেবে দেখ না? (২৫) আর অবশ্যই আমি নূহ (আঃ)-কে তাঁর জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি (তিনি বললেন) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। (২৬) তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো এবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদের বাপেরে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আখ্যাবের ভয় করছি। (২৭) তখন তাঁর কওমের কাফের প্রধানরা বলল—আমরা তো আপনাকে আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না; আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার অনুসৃত্য করতে দেখি না এবং আমাদের উপর আপনাদের কোন প্রাধান্য দেখি না, বরং আপনারা সবাই মিথ্যাবাদী বলে আমরা মনে করি। (২৮) নূহ (আঃ) বললেন—হে আমার জাতি। দেখ তো আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর থাকি, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন, তারপরেও তা তোমাদের চোখে না পড়ে, তাহলে আমি কি উহা তোমাদের উপর তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চাপিয়ে দিতে পারি?

وَيَقُولُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَالِئَانِ أَجْرِيَ الْاَعْلَىٰ اللَّهُ وَمَا أَنَا  
 بِظَالِمٍ لِّلَّذِينَ اسْتَأْذَنُوا مِنِّي مَلْفُؤًا وَّوَمًا ۝ وَلَكِنِّي أَرْأَىٰكُمْ قَوْمًا  
 يَجْتَهُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَن يَتَصَرَّفُنِي مِن اللّٰهِ إِنَّ طَرْدَ قَوْمِ اَقْلَامٍ  
 تَدَّ كُرُونًا ۝ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنَ اللّٰهِ وَلَا أَعْلَمُ  
 الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي نَبَأٌ وَلَا أَقُولُ لِّلَّذِينَ تَزْدِرِي عَيْنُهُمْ  
 لَن يُوَفِّيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۝ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيْ اَنْفُسِهِمْ ۝ إِنِّي إِذًا  
 لِّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ قَالُوْا لِيُوَفِّرْهُمُ اللّٰهُ مَا كُنْتُمْ تَعْتَدُوْنَ ۝ قَالِ اِنَّمَا يَتَّقِيْكُمْ  
 بِهٖ اللّٰهُ اِنَّ سَاءَ مَا تَحْكُمُوْنَ بِعِزِّيْنَ ۝ وَلَا يَتَّبِعُكُمْ فَضُوْنٌ اِنَّ  
 اَرْضَكُمْ اَنْ اَصْحَمَ لَكُمْ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يَرِيْدُ اَنْ يُثَوِّبَ قَوْمًا  
 وَّالْيَهُ سُوءُوْنَ ۝ اَمْ يَقُولُوْنَ اَفْتَرٰهُ قُلْ اِن اَفْتَرَيْتُ  
 فَعَلَى الْاِجْرَامِ وَاَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝ وَاَوْحِيَ اِلَيَّ ذُوْرُ  
 اَنَّهُ لَن يُوْفِيَنَّ مِنْ قَوْمِكَ الْاٰمَنُ قَدًا مِّنْ فَلَآ تَمْسَسْ  
 بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝ وَاَصْنَعِ الْكُلَّ بِاَعْيُنِنَا وَّوَحِيْنَا  
 وَلَا تَخَاطَبُنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۝ اِنَّهُمْ مُّثَقَّفُوْنَ ۝

(১৫) আর হে আমার জাতি! আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ  
 দিই নই আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর জিন্মায় রয়েছে। আমি কিন্তু  
 ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তার  
 সন্তোষ লাভ করবে। বরঞ্চ তোমাদেরই আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখছি।  
 (১৬) আর হে আমার জাতি! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তাহলে  
 ঈমানদারকে আল্লাহ হতে রেহাই দেবে কে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না?  
 (১৭) আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভালভার  
 রয়েছে এক একথাও বলি না যে, আমি গায়বী স্ববরও জানি; একথাও বলি  
 য় যে, আমি একজন ফেরেশত; আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লালিত  
 আল্লাহ তাদের কোন কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ  
 জ্ঞান করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অনায়্যকারী হব  
 (১৮) তারা বলল—হে হূ! আমাদের সাথে আপনি তর্ক করেছেন এক  
 জনকে কলহ করেছেন। এখন আপনার সেই আযাব নিয়ে আসুন, যে  
 আপনাকে আপনি আমাদিনাকে সতর্ক করেছেন, যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে  
 থাকেন। (১৯) তিনি বলেন, উহা তোমাদের কাছে আল্লাহই আনবেন, যদি  
 তিনি ইচ্ছা করেন তখন তোমরা পালিয়ে তাঁকে অপারগ করতে পারবে না।  
 (২০) আর আমি তোমাদের নসীহত করতে চাইলেও তা তোমাদের জন্য  
 কল্যাণ হব না, যদি আল্লাহ তোমাদেরকে গোমরাহ করতে চান; তিনিই  
 তোমাদের পালনকর্তা এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।  
 (২১) তারা কি বলে? আপনি কোরআন রচনা করে এনেছেন? আপনি  
 মূল দিন আমি যদি রচনা করে এনে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার, আর  
 তোমরা যেসব অপরাধ কর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (২২) আর  
 হূ নূহ (আঃ)—এর প্রতি ওহী প্রেরণ করা হলো যে, যারা ইতিমধ্যেই  
 ঈমান এনেছে তাদের হাড়া আপনার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবেন না।  
 অতএব, তাদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হবেন না। (২৩) আর আপনি আমার  
 সন্থুখে আমারই নির্দেশ মোতাবেক একটি নৌকা তৈরী করুন এবং  
 পশ্চিমের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুব  
 যাবে।

উপর অটল রয়েছ।

কিন্তু পয়গম্বরগণের মাধ্যমে আগত আল্লাহর রহমত জোর-জবরদস্তি  
 মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জিনিষ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা  
 সেদিকে আগ্রহান্বিত না হয়। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঈমানের  
 অমূল্য দৌলত যা আমি নিয়ে এসেছি, আমার যদি সাধ্য থাকত তবে  
 তোমাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তোমাদেরকে তা দিয়েই দিতাম।  
 কিন্তু এটি আল্লাহর চিরন্তন বিধানের পরিপন্থী। এ মূল্যবান সম্পদ জোর  
 করে কারো মাথায় তুলে দেয়া যায় না। এতদূরার আরো সাব্যস্ত হচ্ছে যে,  
 জোর-জবরদস্তি কাউকে মুমিন বা মুসলমান বানানো কোন নবীর যুগেই  
 বৈধ ও অনুমোদিত ছিল না। তরবারির জ্বোরে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে  
 বলে যারা মিথ্যা দুর্নাম রচনা করে তাদেরও একথা অজানা নয়। তথাপি  
 অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদের অন্তরে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অসমুদ্যে  
 প্রণোদিত হয়ে এহেন অপবাদ ছড়ানো হয়।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টতঃ বোঝা গেল যে, কোন  
 ফেরেশতাকে নবীরূপে পাঠানো হয়নি কেন? কারণ, ফেরেশতারা  
 অসাধারণ শক্তি ও ক্ষমতাসম্পন্ন। সবদিক থেকেই তাদের সত্তা মানুষের  
 তুলনায় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সুতরাং, তাঁদের দেখলে তো ঈমান আনা  
 বাধ্যতামূলক কাজ হত। নবীগণের সাথে বেরূপ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতা করা  
 হয়েছে, ফেরেশতাদের সামনে সেরূপ আচরণ করার কার সাধ্য ছিল?  
 আর কোন পরাক্রমশালী শক্তির প্রভাবে বাধ্য হয়ে ঈমান আনা হলে  
 শরীয়তের দৃষ্টিতে তা ধর্ষত্ব ও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং 'ঈমান বিল-গায়ব'  
 অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার প্রবল পরাক্রম প্রত্যক্ষ না করেই তাঁর প্রতি  
 ঈমান আনয়ন করতে হবে।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল— وَمَا تَرَكُ اَبْعَاكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ  
 اَرَادُوْا نَابِوِي الْوَاوِي

অর্থাৎ, আমরা দেখছি যে, আপনার প্রতি ঈমান  
 আনয়নকারী এবং আপনার আনুগত্য ও অনুসরণকারী সবাই আমাদের  
 সমাজের মধ্যে সবচেয়ে ইতর, ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন। তাদের মধ্যে কোন  
 সভ্যত, মর্যাদাসম্পন্ন, ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখি না। এই উক্তির মধ্যে  
 দু'টি দিক রয়েছে। এক হচ্ছে, আপনার দাবী যদি সত্য ও সঠিক হতো,  
 তাহলে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গই তা সর্বপ্রথমে গ্রহণ করত। কিন্তু তারা তা  
 প্রত্যাখ্যান করছে; আর স্থূলবুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির তা যেনে  
 নিচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনার প্রতি ঈমান আনলে আমরাও আহম্মকরূপে  
 পরিচিত ও শিকৃত হব। দ্বিতীয় হচ্ছে— সমাজের নিকৃষ্ট, ইতর ও ছোট  
 লোকগুলি আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। এক্ষেপে আমরাও যদি  
 আপনার আনুগত্য স্বীকার করি, তবে আমরাও মুসলমান ভাই হিসাবে  
 তাদের সমকক্ষরূপে পরিগণিত হব, নামাযের কাতারে ও অন্যান্য  
 মজলিসে তাদের সাথে এক বরাবর উঠাবসা করতে হবে। ফলে আমাদের  
 আভিজাত্য ও কুলীনতার হানি হবে। অতএব, এ কাজ আমাদের পক্ষে  
 সম্ভব নয়। বরং তাদের ঈমান কবুল করাটা আমাদের ঈমানের পথে  
 প্রতিবন্ধকস্বরূপ। আপনি যদি তাদের নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে  
 দিতে পারেন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়নের কথা  
 বিবেচনা করতে পারি।

বাস্তবজ্ঞান বিবর্জিত কওমের জাহেল লোকেরা সমাজের দরিদ্র ও

দুর্বল শ্রেণীকে ইতর ও ছোটলোক সাব্যস্ত করেছিল—যাদের কাছে পার্থিব ধন-সম্পদ ও বিষয়-বৈভব ছিল না। মূলতঃ তা ছিল তাদের জাহেলী চিন্তাধারার ফল। বস্তুতঃপক্ষে ইচ্ছত ও জিন্দুতি, ধন-দৌলত বিদ্যা-বুদ্ধির অধীন নয়। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সম্পদ এবং সম্মানের মোহ একটি নেশার মত, যা অনেক সময় সত্য-ন্যায়কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, সত্য ও ন্যায় হতে বিচ্যুত করে। দরিদ্র ও দুর্বলদের সম্মুখে যেহেতু এরূপ কোন অন্তরায় থাকে না। কাজেই তারাই সর্বাত্মে সত্য-ন্যায়কে বরণ করতে এগিয়ে আসে। প্রাচীনকাল হতে যুগে যুগে দরিদ্র-দুর্বলরাই সমসাময়িক নবীগণের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিল, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন ঈমানের আহ্বান সম্বলিত রসুলে পাক (সাঃ)—এর পবিত্র চিঠি লাভ করল, তখন গুরুত্ব সহকারে নিজেই ইহার তদন্ত-তাহকীক করতে মনস্থ করল। কেননা, সে তওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব পাঠ করে করে সত্য নবীগণের আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে পুংখানুপুংখরূপে পারদর্শী ছিল। কাজেই তৎকালে আরব দেশের যেসব বাবসায়ী সিরিয়ায় উপস্থিত ছিল, তাদের একত্রিত করে উক্ত আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করে। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল যে, তাঁর অর্থাৎ, রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণী। তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করল, ইহা তো সত্য রসুল হওয়ার লক্ষণ। কেননা, যুগে যুগে দরিদ্র-দুর্বল শ্রেণীই প্রথমে নবীগণের আনুগত্য স্বীকার করেছে।

মোদ্দাকথা, দরিদ্র ও দুর্বল লোকদেরকে ইতর এবং হয়ে মনে করা চরম মুর্খতা ও অন্যায়া। প্রকৃতপক্ষে ইতর ও ঘৃণিত তারাই—যারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা মালিককে চিনে না, তার নির্দেশ মেনে চলে না। হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ)—কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইতর ও কমীনা কে? তিনি উত্তর দিলেন— যারা বাদশাহ ও রাজকর্মচারীদের খোশামোদ-তোষামোদে লিপ্ত হয়, তারাই কমীনা ও ইতর। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রাঃ) বলেন, যারা দ্বীন-ধর্ম বিক্রি করে দুনিয়া হাসিল করে তারাই কমীনা। পুনরায় প্রশ্ন করা হল—সবচেয়ে কমীনা কে? তিনি জবাব দিলেন—যে ব্যক্তি অন্যের পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের দ্বীন ও ঈমানকে বরবাদ করে। হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেলাম (রাঃ)—গণের নিন্দা-সমালোচনা করে, সে-ই ইতর ও অর্বাচীন। কারণ, তাঁরাই সমগ্র উম্মতের সর্বাপেক্ষা হিত সাধনকারী। তাঁদের মাধ্যমেই ঈমানের অমূল্য দৌলত ও শরীয়তের আহকাম সকলের কাছে পৌছেছে।

যাহোক, ২৯ নং আয়াতে কওমের লোকদের মুর্খতা প্রসূত ধ্যান-ধারণা খন্ডন করার জন্য প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে, কারো ধন-সম্পদের প্রতি নবী-রসুলগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তাঁরা নিজেদের খেদমত ও তা'লীম-তবলীগের বিনিময়ে কারো থেকে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। তাঁদের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তাআলারই দায়িত্বে। কাজেই, তাঁদের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র এক সমান। তোমরা এমন অহেতুক আশঙ্কা পোষণ করো না যে, আমরা ধন-সম্পদশালীরা যদি ঈমান আনয়ন করি তবে হয়ত আমাদের বিস্ত-সম্পদে ভাগ বসানো হবে।

দ্বিতীয়তঃ তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসাবে চাপ সৃষ্টি করছ যেন আমি দীন-দরিদ্র ঈমানদারগণকে তাড়িয়ে দেই। কিন্তু আমার দ্বারা তা কখনো সম্ভবপর নয়। কারণ, আর্থিক দিক দিয়ে তারা দরিদ্র হলেও আল্লাহ রাব্বুল ইচ্ছতের দরবারে তাদের

প্রবেশাধিকার ও উচ্চমর্যাদা রয়েছে। এমন লোকদেরকে তাড়িয়ে দেয়া অন্যায়া-অঙ্গস্ত।

وَلَا أَعْمُرُ الْعِيْبَ “আর আমি গায়বও জানি না।” কেননা, জাহেলদের আরো বিশ্বাস ছিল যে, যারা সত্যিকার পয়গম্বর, তাঁরা নিশ্চয়ই গায়বের খবর জানবেন। হযরত নূহ (আঃ)—এর উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবুওয়ত ও রেসালতের জন্য গায়বের এলুম অপরিহার্য নয়। আর তা হবেই বা কি করে? গায়বের এলুম তো একমাত্র আল্লাহ তাআলার বিশেষ ছেফত বা বৈশিষ্ট্য। কোন নবী, ওলী বা ফেরেশতা ইহার অধীকার হতে পারে না। তাঁদের অত্র গুণে গুণান্বিত মনে করা স্পষ্ট শেরেকী। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তদীয় পয়গম্বরগণের মধ্যে যাকে যতদূর ইচ্ছা করুক জগতের এলুম দান করেন। ইহা নবী-ওলীগণের এখতিয়ারভুক্ত নয় যে, তাঁরা যখন-তখন যে কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে বা বলতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা যখন অবহিত করেন, তখন তাঁদের জন্য তা আর গায়ব থাকে না। অতএব, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে আলেমুল-গায়ব বলা হারাম ও শেরেকী।

তাঁর তৃতীয় উক্তি হয়েছে— وَلَا أَقُولُ لِإِيْتَانِكَ “আর আমি একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা।” এখানে তাদের এ প্রায় চিন্তাধারা বাতিল করা হয়েছে যে, নবী-রসুলরূপে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফেরেশতা প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল।

তাঁর চতুর্থ কথা হচ্ছে—তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা দরিদ্র ঈমানদারগণকে যেরূপ লাঞ্চিত, ক্ষত্রাদিপিক্কুদ দেখছ, আমি কিন্তু তোমাদের মত একটা বলতে পারি না যে, আল্লাহ তাদের কোন কল্যাণ ও কামিয়াবী দান করেন না। কারণ, প্রকৃত কল্যাণও কামিয়াবী ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতার জোর হাসিল করা যায় না। বরং মানুষের অন্তরের অবস্থা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তা দান করা হয়। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সম্যক অবহিত আছেন যে, কল্যাণ ও কামিয়াবী হাসিল করার জন্য কার অন্তর যোগ্য, আর কার অন্তর অযোগ্য। অতএব, তিনিই তার ফয়সালা করবেন।

পরিশেষে হযরত নূহ (আঃ) বলেন, তোমাদের মত আমিও যদি দরিদ্র ঈমানদারগণকে লাঞ্চিত-অবাস্তিত মনে করি, তাহলে আমিও জালেমরূপে পরিগণিত হবো।

আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)—কে প্রায় এক হাজার বছরের পূর্ব জীবন দান করেছিলেন। সাথে সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া ও দেশবাসীকে সুপথে পরিচালিত করার চিন্তা-ভাবনা এবং পয়গম্বরস্বরূপে উৎসাহ-উদ্দীপনা এতদূর দান করেছিলেন যে, সারাজীবন তিনি অক্লান্তভাবে নিজ জাতিতে তওহীদ ও সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কওমের পক্ষ হতে তিনি কঠিন নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হন, তাঁর উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়; এমনকি তিনি অনেক সমর রক্তাক্ত হয়ে বেহুশ হয়ে পড়তেন। অতঃপর হুশ হলে পরে দোহা করতেন—আয় আল্লাহ! আমার জাতিতে ক্ষমা করন, তারা অঙ্গ-মূর্খ তারা জানে না, বোঝে না। তিনি এক পুরুষের পরে দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরুষকে শুধু এ আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, হযরত তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত প্রাণশ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা যখন ঈমান আনল না, তখন তিনি আল্লাহ রাব্বুল ইচ্ছতের দরবারে তাদের সম্পর্কে ফরিয়াদ করলেন—

إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْسَ لَكُمْ رَأْفَةٌ مِّنِّي إِلَّا فِرَارًا



অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আমি আমার জাতিকে দিব-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। আমার দাওয়াত তাদের শুধু সত্যপথ থেকে পলায়নের প্রবণতাই করেছে।'—(সূরা নূহ)

সুদীর্ঘকাল যাবত অসহনীয় কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করার পর তিনি দোয়া করেন— رَبِّ لَصَوِّرُنِي طَيِّبًا إِنَّ يَوْمَ الْإِخْرَاقِ هِيَ تَارَةٌ مَجْدِيدَةٌ ۝۱۫ হে আল্লাহ্! আমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ করুন। কেননা, ওরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। —(১৮ আয়াত ৩৯ সূরা আল-মুমেনুন।)

দেশবাসীর জুলুম-নির্যাতন, অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ সীমা অতিক্রম করার পর আল্লাহ্ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)-কে উপরোক্ত আয়াত দ্বারা স্মরণ করেন।—(বেগতী ও মাঘহারী)

৩৩ নং আয়াতে হযরত নূহ (আঃ)-কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আপনার কণ্ঠের মধ্যে যাদের ঈমান আনার যোগ্যতা ছিল, তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। বৃহত্তা ও হঠকারিতার কারণে তাদের অন্তর মোহরাস্তিত হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তাদের জন্য চিন্তিত, দুঃখিত বা বিমর্ষ হবেন না।

৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অচিরেই আমি এ জাতির উপর ঈমান আনবে আকারে আঘাঘ অবতীর্ণ করব। কাজেই আপনি একখানি নৌকা তৈরি করুন যার মধ্যে আপনার পরিজনবর্গ, অনুসারীবৃন্দ ও প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ ও উপকরণাদিসহ স্থান সঙ্কুলান হয়। যেন উহাতে আরোহণ করে প্লাবনের দিনগুলি নিরাপদে অতিবাহিত করতে পারেন। হযরত নূহ (আঃ) নৌকা তৈরী করলেন। অতঃপর প্লাবনের প্রাথমিক আলামত হিসাবে ভূমি হতে পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। নূহ (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হল সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় আরোহণ করার জন্য। আর মানুষের প্রয়োজনীয় খোড়া, গাধা, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাণীর এক-এক জোড়া নৌকায় তুলে নেয়ার আদেশ দেয়া হল। তিনি আদেশ পালন করলেন।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও নৌকায় আরোহণকারীরা সংখ্যায় অতি অল্প ছিল।

আলোচ্য আয়াতগুলি সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এতক্ষণ বলা হল, এবার প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যা ও আনুমানিক মাসায়েল বর্ণনা করা হচ্ছে।

৩৬ নং আয়াতে এরশাদ করেছেন— হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি ওহী নাথিল করা হয়েছিল যে, তাঁর জাতির মধ্যে ভবিষ্যতে আর কেউ ঈমান আনবে না। তারা আপনার সাথে যেসব দুর্ব্যবহার করেছে আপনি তাতে চিন্তিত ও বিমর্ষ হবেন না। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-অস্থিরতা থাকে। নিরাশ হওয়ার মধ্যেও এক ধরার শান্তি রয়েছে। অতএব, আপনি তাদের সংশোধনের আশা ত্যাগ করুন এবং তাদের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় থাকুন।

৩৭ নং আয়াতে তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। এরূপ অবস্থায়ই হযরত নূহ (আঃ)-এর মুখে তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছিল—

رَبِّ ارْتَدَّ رَعْلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَلْبِ مِنَ دَكَّاءٍ إِنَّكَ لَإِنَّ سَدَّ مُهْرًا

يُؤْتِيهِمْ عَمَادًا وَلَا يَكِيدُ وَلَا يُؤْتِيهِمْ عَمَادًا كَمَا كَانُوا

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার! এখন এই কাফেরদের মধ্যে পৃথিবীর নুকে বসবাসকারী কাউকে রাখবেন না। যদি তাদের রাখেন, তবে তাদের ভবিষ্যত বংশধররাও অবাধ্য কাফের হবে। (পারা ২৯ - সূরা নূহ, আয়াত ২৬)

এই বদদোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হল। যার ফলে সমস্ত কণ্ঠে নূহ (আঃ) ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

হযরত নূহ (আঃ)-কে নৌকা তৈরী শিক্ষা দান : হযরত নূহ (আঃ)-কে যখন নৌকা তৈরীর নির্দেশ দেয়া হল, তখন তিনি নৌকাও চিনতেন না, তৈরী করতেও জানতেন না। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেন— وَأَصْنَعُ الْفُلَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَأَنْتَ أَعْيُنَنَا وَوَجْهِنَا করুন আমার তত্ত্বাবধানে ও ওহী অনুসারে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নৌকা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল ওহীর মাধ্যমে হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি শাল কাঠ দ্বারা উক্ত নৌকা তৈরী করেছিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নৌকাখানি ৩০০ গজ দীর্ঘ, ৫০ গজ প্রস্থ, ৩০ গজ উচ্চ ও ত্রিতল বিশিষ্ট ছিল। উহার দুইপার্শ্বে অনেকগুলি জানালা ছিল। এভাবে ওহীর মাধ্যমে হযরত নূহ (আঃ)-এর হাতে নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল। অতঃপর যুগে যুগে তার উন্নতি সাধিত হয়ে চলেছে।

প্রতিটি শিল্পকর্মের সূচনা ওহীর মাধ্যমে হয়েছে : হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রচিত “আত-তিব্বুন-নব্বী” কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম ওহীর মাধ্যমে কোন নবীর পবিত্র হস্তে শুরু হয়েছে। অতঃপর প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে তার মধ্যে উন্নতি-অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত আদাম (আঃ)-এর প্রতি যেসব ওহী নাথিল করা হয়েছিল তার অধিকাংশ ছিল ভূমি আবাদ করা, কৃষিকার্য ও শিল্পসংক্রান্ত। পরিবহনের জন্য চাকা চলতি গাড়ী হযরত আদাম (আঃ)-ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন, কালের বিবর্তনে বিভিন্ন প্রকার গাড়ী আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সব গাড়ীর ভিত্তি চাকার উপর। গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী হতে শুরু করে মোটর ও রেলগাড়ী সর্বত্র চাকার কারবার। কাজেই, যিনি সর্বপ্রথম চাকা আবিষ্কার করেছেন তিনিই সবচেয়ে বড় আবিষ্কারক। আর একথা আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নবী হযরত আদাম (আঃ)-ই ওহীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম চাকার আবিষ্কার করেছিলেন।

এদ্বারা আরো বোঝা গেল যে, মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন। তাই আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রসূলগণকে ওহীর সাহায্যে তা শিক্ষাদান করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)-কে নৌকা নির্মাণপদ্ধতি ও কলা-কৌশল শিক্ষা দানের সাথে সাথে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনার কণ্ঠের উপর এক মহাপ্রাণ আসবে, তারা সবাই ডুবে মরবে, তখন আপনি স্নেহবশ হয়ে তাদের জন্য কোন সুপারিশ যেন না করেন।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَائِكُن قَوْمِهِ سَيُّرُوا مِنْهُ  
 قَالِ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا وَإِنَّا لَنَشْكُرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالِ لَكُمْ  
 نَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ  
 مُقِيمٌ ﴿٧٨﴾ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ مُرْتَضًا وَقَالَ لَتَتُورُنَّ إِنَّمَالِ فِيهِمَا مِنْ  
 كُلِّ رَوْحَيْنِ أَتَيْنَ وَأَهْلِكَ الْأَمْنِ سَقَى عَلَيْهِ الْقَوْلِ  
 وَمَنْ آمَنَ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ الْإِنْفِيلِ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الْكُوفِرِينَ  
 اللَّهُ يَجْرُهَا وَمُرْسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٠﴾ وَهِيَ تَجْرِي  
 بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَتَأْذَى مَوْجُ رَبِّهِ وَكَانَ فِي  
 مَعْرُورٍ يُبْذَى الْوَكْبَ مَعْنًا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٨١﴾ قَالَ سَرُورِي  
 إِلَى جَبَلٍ يَخُومُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لِأَهْلِ عَمْرِؤِ مَنِ  
 اللَّهُ الْأَمْنِ رَحْمَةً وَحَالٍ بَيْنَهُمَا الْيَوْمِ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٨٢﴾  
 وَقِيلَ يَا رَأْسُ ابْنِ عَمْرٍ مَاءُكَ وَيَسَاءَ أَفْعَابِي وَغِيضُ الْمَاءِ  
 وَقِيضُ الْأَمْرِ وَالْمَسُوتِ عَلَى الْيُودِيِّ وَقِيلَ بَعْدَ اللَّقْمِ  
 الظِّلْمِينَ ﴿٨٣﴾ وَتَأْذَى مَوْجُ رَبِّهِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي مِنْ  
 أَهْلِ الْوَأْتِ وَأَعْدَاكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٤﴾

(৩৮) তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন, আর তাঁর কণ্ঠের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির যখন পাশু দিয়ে যেত, তখন তাঁকে বিক্রম করত। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রূপ তোমাদের উপহাস করছি। (৩৯) অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে—লাঞ্ছনাজনক আযাব কার উপর আসে এবং চিরস্থায়ী আযাব কার উপর অবতরণ করে। (৪০) অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌছল এবং ভূ-পৃষ্ঠ উচ্ছসিত হয়ে উঠল, আমি বললামঃ সর্বপ্রকার জোড়ার দুটি করে এবং যাদের উপরে পূর্বাঙ্কেই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদ দিয়ে, আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিল। বলাবাহুল্য, অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল। (৪১) আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ, যেহেতু বান। (৪২) আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পর্বতভ্রমণ তরঙ্গমালার মাঝে, আর নূহ (আঃ) তাঁর পুরূকে ডাক দিলেন আর সে সরে রয়েছিল, তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে থেকে না। (৪৩) সে বলল, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ (আঃ) বললেন, আজকের দিনে আল্লাহর হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হল। (৪৪) আর নির্দেশ দেয়া হল — হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ, ক্ষান্ত হও। আর পানি হাস করা হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল, দুরাভূ কাফেররা নিপাত যাক। (৪৫) আর নূহ (আঃ) তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন— হে পরওয়ারদেগার, আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত, আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বশেষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী।

৩৮ নং আয়াতে নৌকা তৈরীকালীন সময়ে নূহ (আঃ)—এর কণ্ঠের উদাসীনতা, গাফলতি, অবজ্ঞা ও দুঃসাহস এবং এর শোচনীয় পরিপন্থি বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশক্রমে হযরত নূহ (আঃ) যখন নৌকা নির্মাণকার্যে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে কণ্ঠের বিশিষ্ট ব্যক্তির তাঁকে জিজ্ঞেস করত, আপনি কি করছেন? তিনি উত্তর দিতেন, অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে, তাই নৌকা তৈরী করছি। তখন তারা বলত —“এখানে তো পানি করার মত পানিও দুলত, আর আপনি ডাঙ্গা দিয়ে জাহাজ চালাবার ফিকিরে আছেন।” তদুত্তরে হযরত নূহ (আঃ) বলতেন, যদিও আজ তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস করছ, কিন্তু মনে রেখো, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করব। অর্থাৎ, তোমরা উপহাসের পাত্র হবে। বস্তুতঃ নবীল কখনো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন না। কাউকে উপহাস করা তাঁদের শান ও মর্যাদার পরিপন্থী, বরং হারাম। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে—

لَا تَسْتَحْزِرُوا قَوْمَ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْكُمْ

অর্থাৎ, “এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে উপহাস করবে না। হতে পারে যে, উপহাসকারীদের চেয়ে যাদের উপহাস করা হচ্ছে (আল্লাহর কাছে) তারাই শ্রেষ্ঠতর।” (পারা ২৬ঃ সূরা হুজুরাত, ১১ আয়াত) সুতরাং পূর্বাঙ্কে আয়াতে উপহাস করার অর্থ কাজের মাধ্যমে জবাব দেয়া। সেমতে ‘আমরা তোমাদেরকে উপহাস করব’ বাক্যের অর্থ হচ্ছে— তোমরা যখন আযাবে পতিত হবে, তখন আমরা তোমাদেরকে বলব যে, ‘এটা তোমাদের উপহাসের মর্মান্তিক পরিণতি।’ যেমন ৩৯ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, “অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কাফের উপর লাঞ্ছনাজনক আযাব আসছে এবং চিরস্থায়ী আযাব কাফের উপর হয়।” প্রথম عَذَابٌ শব্দের দ্বারা দুনিয়ার আযাব এবং ثَوَابٌ দ্বারা আখেরাতের চিরস্থায়ী আযাব উদ্দেশ্য।

৪০ আয়াতে প্লাবন আরম্ভকালীন করণীয় ও আনুষঙ্গিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ مُرْتَضًا وَقَالَ لَتَتُورُنَّ

অর্থাৎ, ‘অবশেষে যখন আমার ফয়সালা কার্যকরী করার সময় হল এবং উনুন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল।’

التَّوْرُ তানুর শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। ভূপৃষ্ঠকেও তানুর বলা হয়, ক্রটি পাকানের তন্দুরকেও তানুর বলে, যমীনের উঁচু অংশকেও তানুর বলে। তাই তফসীরকার ইমামগণের কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতে তানুর অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি হয়ে পানি উথলে উঠছিল। কেউ কেউ বলেন— এখানে তানুর বলে হযরত আদম (আঃ)—এর স্ত্রী পাকানো তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে, যা সিরিয়ানর عين ورد ‘আইব আরদাহ’ নামক স্থানে অবস্থিত। উক্ত তন্দুরের ভেতর থেকেই সর্বপ্রথম পানি উঠতে শুরু করেছিল। কেউ বলেন— এখানে হযরত নূহ (আঃ)—এর তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে—যা কুফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, শা’বী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ অধিকাংশ মুফাসসরীন এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শা’বী (রহঃ) কসম করে বলেছেন যে, উক্ত তন্দুর কুফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কুফার বর্তমান মসজিদের মধ্যবর্তী

হযরত নূহ্ (আঃ) তাঁর নৌকা তৈরী করেছিলেন। আর তন্দুর ছিল ঐ নৌকার প্রবেশ দ্বার।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আন্লাহ্ তাআলা নূহ্ (আঃ)-কে মহাপ্রাণবনের পূর্বাভাসস্বরূপ আগেই জানিয়েছিলেন যে, যখন আপনার ঘরের উনুন ফেটে পানি উঠতে দেখবেন, তখন ফেরত ফেরত যাবেন, মহাপ্রাণবন শুরু হয়েছে।— (তফসীরে-কুরত্বুবী ও মজলিস)

আন্লাহ্ কুরত্বুবী (রহঃ) বলেন, তান্নুর শব্দের ব্যাখ্যায় মতভেদ প্রকাশিত হলেও আসলে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, প্রাণবন যখন শুরু হলে, তখন রুটি পাকানো তন্দুর হতেও পানি উঠেছে, সমতলভূমি হতেও উঠেছে আর উচু যমীন হতেও পানি উঠেছে। সিরিয়ার আইনুল মাদিনার তন্দুর হতেও উঠেছে এবং কুফার তন্দুর হতেও উঠেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সব একাকার হয়েছে। যেমন কোরআন পাকের আয়াতে স্পষ্ট প্রমাণ করা হয়েছে—

فَقَضَىٰ إِلَٰهَ رَبِّكَ السَّمَانَ مَائًا مُّغْفِرًا ۖ وَالْأَرْضَ حَيْوَاتًا

অর্থঃ, ‘অতঃপর আমি মুঘলধারায় বর্ষণের সাথে সাথে আসমানের কুসুমখুলে খুলে দিলাম এবং যমীনে প্রস্রবণরূপে প্রবাহমান করলাম। — (২৭ সূরা আল-কামার, আয়াত-১১)

ইহাম শা’বী (রঃ) আরো বলেছেন যে, কুফার এই জা’মে মসজিদটি মসজিদে হারাম, মসজিদে-নব্বী ও মসজিদে-আকসার পর বিশেষ বিশিষ্ট্যসম্পন্ন বিশুর চতুর্থ মসজিদ।

তুফান শুরু হওয়া মাত্র হযরত নূহ্ (আঃ)-কে হুকুম দেয়া হল—

اٰجِلٌ لِّهٖ لَمَّا مَنَّ لَّيْلٌ وَرُجُؤُنَا الشِّمٰوِیۡنِ

অর্থঃ, ‘জোড়বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এক-এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিন।’ এতদ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত নূহ্ (আঃ)-এর জাহাজে সারা দুনিয়ার সব ধরনের প্রাণীর সমাবেশ করা হয়নি। বরং যেসব প্রাণী শব্দী-পুরুষের মিলনে জন্ম হয় এবং পানির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না, শুধু সেসব পশু-পাখীই উঠানো হয়েছিল জলজ প্রাণী উঠানো হয়নি। এদের প্রাণীকুলের মধ্যে যেসব পোকা-মাড়, কীট-পতঙ্গ, পুরুষ-স্ত্রীর মিলন ছাড়াই জন্ম হয় তাও বাদ পড়েছে। শুধু গরু, ছাগল, ঘোড়া-গাধা ইত্যাদি গৃহপালিত ও অতীত প্রয়োজনীয় পশু-পাখী কিশতিতে উঠানো হয়েছিল। এতদ্বারা এ সন্দেহ দূরীভূত হল যে, সারা দুনিয়ার সর্বপ্রকার প্রাণীকুলের স্থান সঙ্কুলান এতদুকু কিশতিতে কিভাবে হলো?

অতঃপর হযরত নূহ্ (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বেঈমান কাফেরদের বাদ দিয়ে আপনার পরিজনবর্গকে এবং সমস্ত ঈমানদারগণকে কিশতিতে তুলে নিন। তবে তৎকালে ঈমানদারদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল।

জাহাজে আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা কোরআনে ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৮০ জন। যাদের মধ্যে হযরত নূহ্ (আঃ)-এর তিন পুত্র হাম, সাম, ইয়াকেস এবং তাদের ৩ জন স্ত্রীও ছিল। নূহ্ (আঃ)-এর চতুর্থ পুত্র কেন’আন কাফেরদের সাথে থাকায় সে ডুবে মরেছিল।

যানবাহনে আরোহণের আদব : ৪১ আয়াতে নৌকা-জাহাজ ইত্যাদি

জল-যানে আরোহণ করার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, بِسْمِ اللّٰهِ جَرِّهَا وَمُرْسِمَهَا ۗ اِنَّ رَبَّیۡ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ বলে আরোহণ করবে।

মজরী মাজরে’ অর্থ চলা, গতিশীল হওয়া।

‘মুরসা’ অর্থ স্থিতি বা থামা। অর্থাৎ, অত্র কিশতির গতি ও স্থিতি আন্লাহ্‌র নামে, এর চলা ও থামা আন্লাহ্ তাআলার মজি ও কুদরতের অধীন।

প্রতিটি যানবাহনের গতি-স্থিতি আন্লাহ্‌র কুদরতের অধীন ; সামান্য চিন্তা করলেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারত যে, জলমান, স্থলযান, ও শূন্যযান অথবা কোন জানদার সওয়ারী যেক, তা সৃষ্টি বা নির্মাণ করা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। স্থূলদৃষ্টিতে মানুষ হয়ত এই বলে আশ্চর্যান করতে পারে যে, আমরা তা তৈরী করেছি, আমরা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে তার লোহা-লকড়, তামা-পিতল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি মূল উপাদান ও কাঁচামাল তারা সৃষ্টি করে না। এক তোলা লোহা বা এক ইঞ্চি কাঠ তৈরী করার ক্ষমতাও তাদের নেই। অধিকন্তু উক্ত কাঁচামাল দ্বারা রকমারী যন্ত্রাংশ তৈরী করার কলাকৌশল তাদের মস্তিষ্কে কে দান করেছে? মানুষ শুধু নিজ বুদ্ধির জোরে যদি তা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করতে পারত, তাহলে দুনিয়ায় কোন নির্বোধ লোক থাকত না। সবাই এরিস্টটল, প্লেটো, এডিসন বনে যেত। কোথাকার কাঠ, কোন খনির লোহা, আর কোন দেশের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যানবাহনের কাঠামো তৈরী হয়। অতঃপর শত-শত টন, হাজার হাজার মণ মালামাল বহন করে যমীনের উপর দৌড়ানো বা হাওয়ার উপর উড়ার জন্য যে শক্তি অপরিহার্য তা পানি ও বায়ুর ঘর্ষণে বিদ্যুতরূপে হোক বা জ্বালানী তেল ইত্যাদি হোক সর্ববিস্ময় চিন্তা করে দেখুন, তন্মধ্যে কোনটি মানুষ সৃষ্টি করেছে? বায়ু বা পানি কি সে সৃষ্টি করেছে? তেল বা পেট্রোল কি সে সৃষ্টি করেছে? তার অভিজ্ঞেন ও হাইড্রোজেন শক্তি কি মানুষ সৃষ্টি করেছে?

মানুষ যদি বিবেককে সামান্য কাজে লাগায়, তাহলে অনায়াসে অনুধাবন করতে পারে যে, বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কারের যুগেও মানুষ একেবারে অক্ষম ও অসহায়। আর এটি অনস্বীকার্য সত্য যে, প্রত্যেকটি যানবাহনের গতি ও স্থিতি, নিয়ন্ত্রণ ও হেফাজত একমাত্র আন্লাহ্ তাআলার কুদরতের অধীন।

আত্মভোলা মানুষ তাদের বাহ্যিক জোড়া-তালির কার্যকলাপ যাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নাম দিয়েছে তার উপর গৌরব ও অহংকারের নেশায় এমন মাতাল হয়েছে যে, মৌলিক সত্যটি তাদের চোখে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এহেন বিভ্রান্তির বেড়াঙ্গল হতে মানুষকে মুক্ত করার জন্যই আন্লাহ্ পাক যুগে যুগে স্বীয় পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ جَرِّهَا وَمُرْسِمَهَا একমাত্র আন্লাহ্‌র নামেই এর গতি ও

স্থিতি বলে মৌল সত্যকে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটি মাত্র দুই শব্দবিশিষ্ট একটি বাক্য হলেও বস্তুরূপে এটা এমন একটা ধারণার প্রতি পথনির্দেশ করে, যদ্বারা মানুষ বস্তুরূপে বসবাস করেও ভাবজগতের অধিবাসীতে পরিণত হয় এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে সৃষ্টিকর্তার বাস্তব উপস্থিতি অবলোকন করতে সক্ষম হয়।

মুমিনের দুনিয়াদারী ও কাফেরের দুনিয়াদারীর মধ্যে এখানেই স্পষ্ট ব্যবধান। যানবাহনে উভয়েই আরোহণ করে, কিন্তু মুমিন যখন কোন

যানবাহনে আরোহণ করে, তখন সে শুধু যমীনের দূরত্বই অতিক্রম করে না, বরং আধ্যাত্মিক জগতেও পরিভ্রমণ করে থাকে।

৪২ ও ৪৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ্ (আঃ)—এর পরিজনবর্গ কিশতিতে আরোহণ করল, কিন্তু ‘কেনআন’ নামক একটি ছেলে বাইরে রয়ে গেল। তখন পিতৃসুলভ স্নেহশতঃ হযরত নূহ্ (আঃ) তাকে ডেকে বললেন, প্রিয় বৎস, আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ কর; কাফেরদের সাথে খেক না, তাহলে পানিতে ডুবে মরবে। কাফের ও দুশমনদের সাথে উক্ত ছেলেটির যোগ-সাজস ছিল এবং সে নিজেও কাফের ছিল। কিন্তু হযরত নূহ্ (আঃ) তার কাফের হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবহিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে যদি তিনি তার কুফরী সম্পর্কে অবহিত থেকে থাকেন, তাহলে তাঁর আহবানের মর্ম হবে—নৌকায় আরোহণের পূর্বশর্ত হিসাবে কুফরী হতে তওবা করে ঈমান আনার দাওয়াত এবং কাফেরদের সংসর্গ পরিত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হতভাগা ‘কেনআন’ তখনও প্লাবনকে অগ্রাহ্য করে বলছিল—আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে প্লাবন হতে আত্মরক্ষা করব। হযরত নূহ্ (আঃ) পুনরায় তাকে সতর্ক করে বললেন যে,—আজকে কোন উচু পর্বত বা প্রাসাদ কাউকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহর খাস রহমত ছাড়া বাঁচার অন্য কোন উপায় নেই। দূর থেকে পিতা-পুত্রের কথোপকথন চলছিল। এমন সময় সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ এসে উভয়ের মাঝে অন্তরালের সৃষ্টি করল এবং কেনআনকে নিমজ্জিত করল। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, হযরত নূহ্ (আঃ)—এর তুফানের সময় এক একটি টেড বড় বড় পাহাড়ের চূড়া হতে ১৫ গজ এবং কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় ৪০ গজ উচ্চতা বিশিষ্ট ছিল।

আলোচ্য ৪৪ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, যমীন ও আসমান

হুকুম পালন করল, প্লাবন সমাপ্ত হল, জুদী পাহাড়ে নৌকা ভিড়ল আর বলে দেয়া হল যে, দুরাত্মা কাফেররা চিরকালের জন্য আল্লাহর রহমত হতে দূরীভূত হয়েছে।

জুদী পাহাড় বর্তমানেও ঐ নামেই পরিচিত। সেটি হযরত নূহ্ (আঃ)—এর মূল আবাসভূমি, ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে ইবনে ওমর দ্বীপের অদূরে আমেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত।

বস্তুতঃ এটি একটি পর্বতমালার অংশবিশেষের নাম। এর অপর এক অংশের নাম আরারাত পর্বত। বর্তমান তওরাতে দেখা যায় যে, হযরত নূহ্ (আঃ) এর কিশতি আরারাত পর্বতে ভিড়েছিল। উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নাই। প্রাচীন ইতিহাসে প্রচলিত বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, জুদী পাহাড়েই কিশতি ভিড়েছিল। প্রাচীন ইতিহাসে আরো উল্লেখ আছে যে, ইরাকের বিভিন্নস্থানে উক্ত কিশতির ভগ্ন টুকরা এখনো অনেকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে, যা বরকতের জন্য সংরক্ষিত হয় এক রোগ ব্যাধিতে ব্যবহার করা হয়।

তফসীরে তাবারী ও বণভীতে আছে যে, হযরত নূহ্ (আঃ) ১০ই রজব কিশতিতে আরোহণ করেছিলেন। দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত উক্ত কিশতি তুফানের মধ্যেই চলছিল। যখন কা’ বা শরীফের পার্শ্বে পৌঁছল, তখন সাত বার কা’ বা শরীফের তওয়াফ করল। আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহ শরীফকে পানির উপরে তুলে রক্ষা করেছিলেন। পরিশেষে ১০ই মুহাররম অর্থাৎ, আশুরার দিন জুদী পাহাড়ে কিশতি ভিড়ল। হযরত নূহ্ (আঃ) স্বয়ং সেদিন শোকরানার রোযা রাখলেন এবং সহযাত্রী সবাইকে রোযা পালনের নির্দেশ দিলেন। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, কিশতিতে অবস্থানরত যাবতীয় প্রাণীও সেদিন রোযা পালন করেছিল।—(তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী)

قَالَ يَبُورُ رَبُّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ وَلَا  
 نَسْتَلِنُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ  
 الْجَاهِلِينَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي  
 بِهِ عِلْمٌ وَالْأَعْتَابُ لِلَّذِينَ أُكْرِمُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝  
 قِيلَ يَا هُوَ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ  
 مِمَّنْ مَعَكَ وَأَمْرٌ وَسَيِّئُهُمْ تُؤْتِيهِمْ وَمِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝  
 رَبِّكَ مِنْ أَتْبَاءِ الْغَيْبِ يُوحِيهِ بِمَا لَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ  
 وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝  
 وَإِلَىٰ عِلَادِٰهُمُ هُوْدًا ۖ قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ  
 إِلَٰهٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَأَقْرَبُ مِنَ الْمُقْتَدِرِينَ ۝ يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ  
 أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عِلْمٌ الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝  
 وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُ وَارْتَدَّ عَنْ رَبِّكَ ثُمَّ نُوِيَ إِلَهُكَ يُرْسِلُ السَّمَاءَ  
 عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُرْدِكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَلِيًّا فَرَاتًا ۚ وَإِن كَرِهَ  
 الْمُجْرِمِينَ ۚ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ وَلَأَمْلَأَنَّ  
 بِنَارِكُمُ الْهِنْدِيَّ عِجْنَ قَوْلِكَ وَمَأْنَعُنَّكَ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ ۚ

(৪৬) আল্লাহ বলেন— হে নূহ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিচই সে দুর্বচার। সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, যার ধর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না। (৪৭) নূহ (আঃ) বলেন— হে আমার পালনকর্তা! আমার যা জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। (৪৮) হুকুম হল—হে নূহ (আঃ)। আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা এবং আপনার নিজের ও সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলির উপর বরকত সহকারে অবতরণ করুন। আর অন্যান্য যেসব সম্প্রদায় রয়েছে আমি তাদেরকেও উপকৃত হতে দেব। অতঃপর তাদের উপর আপনার দারুন আঘাৎ আপতিত হবে। (৪৯) এটি গায়বের ধর, আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করছি। ইতিপূর্বে এটা আপনার এবং আপনার জাতির জন্য ছিল না। আপনি যেরূপ ধারণা করুন। যারা ভয় করে চলে, তাদের পরিণাম ভাল, সন্দেহ নেই। (৫০) আর আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হৃদকে প্রেরণ করছি; তিনি বলেন— হে আমার জাতি, আল্লাহর বন্দগী কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নেই, তোমরা সবাই মিথ্যা আরোপ করছ। (৫১) হে আমার জাতি! আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন মজুরী চাই না; আমার মজুরী তাঁরই কাছে যিনি আমাকে পয়দা করেছেন; তবু তোমরা কেন বোঝ না? (৫২) আর হে আমার কণ্ঠ। তোমাদের পালন কর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর; তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মত বিমূঢ় হয়ে না। (৫৩) তারা বলল— হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আস নাই, আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নেই।

৪৬ আয়াতে আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত নূহ (আঃ)—এর প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, মন-মানসিকতার দিক দিয়ে এ ছেলোট আপনার পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নেই। সে একজন দুরাত্মা কাফের। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা না জেনে আমার কাছে কোন আবেদন করা আপনার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে অজ্ঞতা-সুলভ কাজ না করার জন্য আমি আপনাকে নসীহত করছি।

আল্লাহ তাআলার অত্র ফরমানের মধ্যে দু'টি বিষয় জানা গেল। প্রথম এই যে, হযরত নূহ (আঃ) উক্ত পুত্রটির চূড়ান্ত কাফের হওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, বরং তার মুনাক্কীর কারণে তিনি তাকে ঈমানদার মনে করেছিলেন। তাই তিনি তার জন্য দোয়া করেছিলেন। জানা থাকলে তিনি কিছুতেই এমন দোয়া করতেন না। কেননা আল্লাহ তাআলা নূহ (আঃ)—কে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, وَلَا تَخْطِئُنِي فِي الَّذِينَ ۖ

ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ 'অতঃপর মহাপ্লাবন যখন শুরু হবে, আপনি তখন কোন অবধ্য কাফেরের জন্য আমার কাছে সুপারিশ করবেন না।'—এহেন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের দূরসাহস করা কোন নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুতঃপক্ষে এটি কুফরী অবস্থায় কেনআনকে রক্ষা করার আবদার ছিল না। বরং তাকে ঈমান দান করার জন্য খোদার দরবারে আকুল আবেদন ছিল। কিন্তু হযরত নূহ (আঃ)—এর মত একজন বিশিষ্ট নবী কর্তৃক ভালমত না জেনে-শুনে একরূপ দোয়া করাকেও আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন নি, বরং একরূপ দোয়া তাঁর জন্য অসমীচীন হয়েছে বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। পয়গম্বরের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে এটি এমন একটি ক্রটি যা পরবর্তীকালে তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। তাই হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি যখন তাঁর কাছে সুপারিশের অনুরোধ জানাবে, তখনও তিনি উক্ত ক্রটিকে ওজর হিসাবে ভুলে ধরে বলবেন যে, আমি এমন একটি ভুল করেছি, যার ফলে আজ সুপারিশ করার হিম্মত হয় না।

কাফের ও যালেমের জন্য দোয়া করা জায়েয নয় : উপরোক্ত বয়ান দ্বারা একটি মাসআলা জানা গেল যে, দোয়াকারীর কর্তব্য হচ্ছে যার জন্য ও যে কাজের জন্য দোয়া করা হবে— তা জায়েয, হালাল ও ন্যায়সঙ্গত কি না তা জেনে নেয়া। সন্দেহজনক কোন বিষয়ের জন্য দোয়া করাও নিবিদ্ধ হয়েছে। তফসীরে বয়যাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে রুহুল-মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে যেহেতু সন্দেহজনক ক্ষেত্রে দোয়া করা নিবিদ্ধ হয়েছে, কাজেই জেনে-শুনে অন্যায় ও অবৈধ কাজের পক্ষে দোয়া করা অধিকতর হারাম।

এতদ্বারা আরো জানা গেল যে, বর্তমানে অনেক পীর-বুয়ূগানের নীতি হচ্ছে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন দোয়ার জন্য তাঁদের কাছে আসে, পীর-বুয়ূগান তাদের জন্যই হাত তোলেন, মকসুদ হাসিলের দোয়া করেন। অথচ অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জানা থাকে যে, এ ব্যক্তি যালেম ও অন্যায়কারী, অথবা যে মকসুদের জন্য দোয়া করাকে তা তার জন্য হালাল নয়। এমন কোন চাকরী বা পদ লাভের জন্য দোয়া চায়, যার ফলে সে হারামে লিপ্ত হবে। অথবা কারো হক নষ্ট করে নিজে লাভবান হবে। জেনে শুনে এসব দোয়া করা তো হারাম বটেই, এমনকি সন্দেহজনক ব্যাপারেও প্রকৃত অবস্থা না জেনে দোয়ার জন্য হাত তোলাও সমীচীন নয়।

মুমিন ও কাফেরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব হতে পারে না : এখানে আরো জানা গেল যে, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে যতই নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক থাক না কেন, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উক্ত আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করা যাবে না। কোন ব্যক্তি যতই সম্প্রসৃত বংশীয় হোক না কেন, যতই বড় বৃষ্ণের সন্তান হোক না কেন, এমনকি সৈয়দ বংশীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করুক না কেন, কিন্তু যদি সে ঈমানদার না হয়, তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে তার আভিজাত্য ও নবীর নিকটাত্মীয় হওয়ার কোন মূল্য নেই। ঈমান, তাকওয়া ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে। যার মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ হয়েছে সে পর হলেও আপনজন। অন্যথায় আপন আত্মীয় হলেও সে পর।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও যদি আত্মীয়তার লক্ষ্য রাখা হতো, তাহলে ভাইয়ের উপর ভাই কখনো তলোয়ার চালাতো না। বদর, ওহুদ ও আহযাবের লড়াই তো একই বংশের লোকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। যাতে করে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয়তা বংশ, বর্ণ, ভাষা বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে না, বরং ঈমান, তাকওয়া ও সংকমশীলতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে। তারা যে কোন বংশের, যে কোন গোত্রের, যে কোন বর্ণের, যে কোন দেশের, যে কোন ভাষাভাষী হোক না কেন, সবাই মিলে এক জাতি, একই ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ।

رَبِّمَا الْمُرْسَلُونَ وَرَبِّمَا 'সকল মুসলমান ভাই-ভাই' আয়াতের এটাই মর্মকথা। অপরদিকে যারা ঈমান ও সংকমশীলতা হতে বঞ্চিত, তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সদস্য নয়।

সূরা হুদের ৫০ হতে ৬০ পর্যন্ত ১১ আয়াতে বিশিষ্ট পয়গম্বর হযরত হুদ (আঃ)–এর আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর নামেই অত্র সূরার নামকরণ হয়েছে। অত্র সূরার মধ্যে হযরত নূহ (আঃ) হতে হযরত মুসা (আঃ) পর্যন্ত সাত জন আম্মিয়ায়ে কোরাম (আঃ) ও তদীয় উম্মতগণের কাহিনী কোরআন পাকের বিশেষ বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যার মধ্যে উপদেশ ও শিক্ষামূলক এমন তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে, যা যে কোন অনুভূতিশীল মানুষের অন্তরে ভাবান্তর সৃষ্টি না করে পারে না। তাছাড়া ঈমান ও সংকর্মের বহু মূলনীতি এবং উত্তম পথনির্দেশ রয়েছে।

যদিও অত্র সূরার মধ্যে সাত জন পয়গম্বরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সূরার নামকরণ করা হয়েছে হযরত হুদ (আঃ)–এর নামে। যাতে বোঝা যায় যে, এখানে হযরত হুদ–এর ঘটনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক হযরত হুদ (আঃ)–কে আদ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। দৈহিক আকার-আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে 'আদ জাতিতে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। হযরত হুদ (আঃ)–ও উক্ত জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন—  
أَخَاهُ هُوَذَا  
'তাদের ভাই হুদ'—শব্দে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এত বড় বীর ও শক্তিশালী জাতি তাদের বিবেক ও চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। নিজেদের হাতে তৈরী প্রস্তরমূর্তিকে তারা তাঁদের

মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল।

হযরত হুদ (আঃ) তাঁর কণ্ঠের নিকট যে দুইনী দাওয়াত পেশ করেন, তার তিনটি মূলকথা ৫০, ৫১, ও ৫২ এই তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমতঃ— তওহীদ বা একত্ববাদের আহবান এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্তা বা শক্তিকে এবাদত উপাসনার যোগ্য মনে করা বাতুলতা মার। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি যে তওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছি, এজন্য জীবন উৎসর্গ করছি। তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি এহেন কষ্ট-ক্লেশের পথ কোন স্বার্থে অবলম্বন করছি? আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার বস্তগত কোন ফায়দা বা স্বার্থ হাসিল হচ্ছে না। এটা যদি আল্লাহর নির্দেশ এবং আমার দায়িত্ব না হতো, তাহলে তোমাদেরকে দাওয়াত দিতে ও সংশোধন করতে গিয়ে এত কষ্ট-ক্লেশ বরণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

ওয়াজ্ব নছিবত ও দুইনী দাওয়াতের পারিশ্রমিকঃ কোরআন করীমে প্রায় নবী (আঃ)–গণের যবানীতে এ উক্তি ব্যক্ত হয়েছে যে, "আল্লাহর দুইনের দাওয়াত পৌছানোর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না।" এতে বোঝা যায় যে, দুইনী-দাওয়াত ও তবলীগের কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হলে তা ফলপ্রসূ হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয় যে, যারা ওয়াজ্ব-নসিহত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তাদের কথায় শ্রোতাদের অন্তরে কোন তাসীর করতে পারে না।

তৃতীয়তঃ কথা হচ্ছে, নিজেদের অতীত জীবনে কুফরী, শেরকী ইত্যাদি যত গোনাহ করেছ, সেসব থেকে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য এসব গোনাহ হতে তওবা কর। অর্থাৎ, দৃষ্ট সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা কর যে, আগামীতে আর কখনো এসবের ধারে-কাছেও যাবো না। যদি তোমরা এরূপ সত্যিকার তওবা ও এস্তেগফার করতে পার, (তবে তার বদৌলতে পরকালের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সুখময় জীবন তো লাভ করবেই), অধিকন্তু দুনিয়াতেও ইহার বহু উপকারিতা দেখতে পাবে। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটবে, যথাসময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যার ফলে তোমাদের আহাৰ্য-পানীয়ের প্রাচুর্য হবে, তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য বর্ধিত হবে।

এখানে 'শক্তি' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে দৈহিক শক্তি এবং ধন-বল ও জনবল সবই অন্তর্ভুক্ত। এতদুরা জানা গেল যে, তওবা ও এস্তেগফারের বদৌলতে ইহজীবনেও ধন-সম্পদ এক সন্তানাদির মধ্যে বরকত হয়ে থাকে।

হযরত হুদ (আঃ)–এর আহবানের জ্বাবে তাঁর দেশবাসী মূর্খতাসূলত উত্তর দিল যে, আপনি তো আমাদেরকে কোন মু'জেযা দেখালেন না। শুধু মুখের কথায় আমরা নিজেদের বাপ-দাদার আমলের উপাঙ্গ্য দেব-দেবীগুলোকে বর্জন করবো না। এবং আপনার প্রতি ঈমানও আনব না। বরং আমরা সন্দেহ করছি যে, আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে। তাই আপনি এমন অসলল্লু কথা বলছেন।



(৫৪) বরং আমরা তো বলি যে, আমাদের কোন দেবতা তোমার উপরে পৌনীয় ভূত চাপিয়ে দিয়েছে। হুদ বললেন—আমি আল্লাহকে সাক্ষী করেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নাই তাঁদের সাথে যাদেরকে তোমরা শরিক করছ (৫৫) তারা ছাড়া, তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতঃপর আমাকে কোন অবকাশ দিও না। (৫৬) আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার। পৃথিবীর যুক বিরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই। (৫৭) তথাপি যদি তোমরা মুখ ফেরাও, তবে আমি তোমাদেরকে তা পৌছিয়েছি যা আমার কাছে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে আর আমার পালনকর্তা অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্ফাতিবিক্ষ করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুই বিগড়তে পারবে না; নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগারই প্রতিটি বস্তুর হেফাজতকারী। (৫৮) আর আমার আদেশ যখন উপস্থিত হল, তখন আমি নিজ রহমতে হুদ এবং তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে পরিত্রাণ করি এবং তাদেরকে এক কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করি। (৫৯) এ ছিল 'আদ জাতি, যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতকে অমান্য করেছে, আর তদীয় রসূলগণের অবাধ্যতা করেছে এবং প্রত্যেক উচ্চত বিরাধীদের আদেশ পালন করেছে। (৬০) এ দুনিয়ায় তাদের পিছনে পিছনে লা নত রয়েছে এবং কেয়ামতের দিনেও; জেনে রাখ, 'আদ জাতি তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে, হুদের জাতি 'আদ জাতির প্রতি অভিসম্পাত রয়েছে জেনে রাখ। (৬১) আর সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করি; তিনি বললেন—হে আমার জাতি! আল্লাহর বন্দগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নাই। তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতঃপর, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে চল। আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন; সন্দেহ নেই। (৬২) তারা বলল—হে সালেহ, ইতিপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যা পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে তার পূজা করতে নিষেধ কর? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদের আহবান জানাচ্ছ আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না।

## আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

তদুত্তরে হযরত হুদ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ নির্ভীক কঠে জবাব দিলেন, তোমরা যদি আমার কথা না মান, তবে শোন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব অলীক উপাসাদের প্রতি আমি রুষ্ট ও বিমুখ। এখন তোমরা ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের, আমার উপর আক্রমণের চেষ্টা করে দেখ, আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না। এত বড় কথা আমি এজন্য বলছি যে, আমি আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখি; যিনি আমার এবং তোমাদের একমাত্র পালনকর্তা। ধরাধামে বিচরণশীল সকল প্রাণীই তাঁর মুঠোর মধ্যে। তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া কেউ কারো কোন ক্ষতি করতে পারে না। নিশ্চয় আমার পরওয়ারদেগার সরল পথে রয়েছেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সরল পথে চলবে, সে আল্লাহকে পাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করবেন।

সমগ্র জাতির মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে এমন নির্ভীক ঘোষণা ও তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় আঘাত হানা সত্ত্বেও এত বড় সাহসী ও শক্তিশালী জাতির মধ্যে কেউ তাঁর একটি কেশও স্পর্শ করতে পারল না। বস্তুতঃ এটাও হযরত হুদ (আঃ)—এর একটি মু'জ্জেয। এর দ্বারা একে তো তাদের এ কথার জবাব দেয়া হয়েছে যে, আপনি কোন মু'জ্জেয প্রদর্শন করেননি। দ্বিতীয়তঃ তারা যে বলত আমাদের কোন কোন দেবতা আপনার মস্তিষ্ক বিবৃত করে দিয়েছে তাও বাতিল করা হল। কারণ দেব-দেবীর যদি কোন ক্ষমতা থাকত, তবে এত বড় কথা বলার পর ওরা তাঁকে জীবিত রাখত না।

অতঃপর তিনি বলেন,—তোমরা যদি এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে থাক, তবে জেনে রাখ, যে পয়গাম পৌছাবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌছিয়েছি। অতএব তোমাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব ও গম্বব আপতিত হবে, তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর আমার পরওয়ারদেগার তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে এ পৃথিবীতে আবাদ করাবেন। তোমরা যা করছ তাতে তোমাদেরই সর্বনাশ করছ, আল্লাহ তাআলার কোন ক্ষতি করছ না। আমার পালনকর্তা সবকিছু লক্ষ্য রাখেন, রক্ষাবক্ষণ করেন। তোমাদের সব ধ্যান-ধারণা ও কার্য-কলাপের তিনি খবর রাখেন।

কিন্তু হতভাগার দল হযরত হুদ (আঃ)—এর কোন কথায় কর্পণাত করল না। তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অবিচল রইল। অবশেষে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান রূপে আল্লাহর আযাব নেমে এল। সাত দিন আট রাত যাবত অনবরত ঝড় তুফান বইতে লাগল। বাড়ী-ঘর ধ্বংস গেল, গাছ-পালা উপড়ে পড়ল, গৃহ-ছাদ উড়ে গেল, মানুষ ও সকল জীবজন্তু শূন্য উখিত হয়ে সজ্ঞারে যমীনে নিক্ষিপ্ত হল, এভাবেই সূর্যমুদেহের অধিকারী শক্তিশালী একটি জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল।

'আদ জাতির উপর যখন প্রতিশ্রুত আযাব নামিল হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুযায়ী হযরত হুদ (আঃ) ও সঙ্গী ঈমানদারগণকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আযাব হতে রক্ষা করেন।

'আদ জাতির কাহিনী ও আযাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর অপরাপর লোকদের শিক্ষা ও সতর্কীকরণের জন্য এরশাদ করেছেন যে, কণ্ঠে আদ আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيْتِهِ مِن رَّبِّي وَآتَيْتُمُوهُ  
 رَحْمَةً مِّن بَيْنِ رُبِّي مِنَ اللَّهِ إِنَّ حَصِينَةَ قَمَا رَبِّي وَبَيْنِ عَيْدِ  
 تَحْسِينِ ۖ وَيَقَوْمِ هَذَا نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا كُلَّ فَرْقِ  
 أَرْضِ الْمَلِكِ وَلَا تَمْسُوهَا سُوءًا فَيَأْخُذَ كُرْ عَذَابِ قَوْمِي ۖ  
 فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَعُوا فِي دَارِكُمْ لَكُمْ آيَةٌ ذَلِكُمْ وَعَدَّ عَيْدِ  
 مَكْدُوبِ ۖ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا مِنَ الْبَيْتِ وَأَمَّا جَمْعُهُ  
 بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۖ  
 وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْحَوْا فِي دِيَارِهِمْ خِزْيًا ۖ  
 كَانَ لَكُمْ فِيهَا الْآرَاءُ شُرُودًا أَفَرَأَيْتُمْ أَكْرَبًا  
 يُسُودُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُخْرَىٰ قَالُوا سَلِمًا  
 قَالَ سَلَامٌ قَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ بِرَحْمَةٍ مِّن رَّبِّي وَأَنَا  
 لَأَنْصِلَ إِلَيْهِ لَكُرْهُمُ وَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَئِن لَّمْ يَأْتِنَا  
 أُرْسُلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ۖ وَأَمْرُهُمْ إِيْمَانُهُ فَصَوَّكْتَ قَمِيرَهَا  
 يَا سَعْنُ وَوَمِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُسُودُ ۖ قَالَتْ يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ  
 وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْضُ مَا تُدْعَوْنَ بِهِ قَوْلًا ۖ

(৬৩) সালেহ বললেন—হে আমার জাতি! তোমরা কি মনে কর, আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে বুদ্ধি-বিবেচনা লাভ করে থাকি আর তিনি যদি আমাকে নিজের তরফ হতে রহমত দান করে থাকেন, অতঃপর আমি যদি তাঁর অবস্থা এই তবে তার থেকে কে আমায় রক্ষা করবে? তোমরা তো আমার ক্ষতি ছাড়া কিছুই বুদ্ধি করতে পারবে না। (৬৪) আর হে আমার জাতি! আল্লাহর এ উদ্দীর্ঘ তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতঃপর তাকে আল্লাহর যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও, এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করবে না। নতুবা অতি সঙ্ঘর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে। (৬৫) তবু তারা উহার পা কেটে দিল। তখন সালেহ বললেন—তোমরা নিজদের গৃহে তিনটি দিন উপভোগ করে নাও। ইহা এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না। (৬৬) অতঃপর আমার আযাব যখন উপস্থিত হল, তখন আমি সালেহকে ও তদীয় সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি, এবং সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা তিনিই সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। (৬৭) আর ভয়ঙ্কর গর্জন পাণ্ডিতদের পাকড়াও করল, ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে উশুড় হয়ে পড়ে রইল। (৬৮) যেন তাঁরা কোনদিনই সেখানে ছিল না। যেনে রাখ, নিশ্চয় সামুদ জাতি তাদের পালনকর্তার প্রতি অস্বীকার করেছিল। আরো শুনে রাখ, সামুদ জাতির জন্য অভিশাপ রয়েছে। (৬৯) আর অবশ্যই আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ইব্রাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল তারা বলল— সালাম, তিনিও বললেন— সালাম। অতঃপর অস্পৃশ্যের মধ্যেই তিনি একটি ভূনা করা বাছুর নিয়ে এলেন। (৭০) কিন্তু যখন দেখলেন যে, আহাযের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি সঙ্কীর্ণ হলেন এবং মনে মনে তাঁদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগলেন। তারা বলল—ভয় পাবেন না। আমরা লুতের কণ্ঠের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৭১) তাঁর স্ত্রীও নিকটেই দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুখের দিলাম এবং ইসহাকের পরের ইয়াকুবেরও। (৭২) সে বলল—কি দুর্ভাগ্য আমার। আমি সম্ভান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এতো ভারী আশ্চর্য কথা!

রসূলগণকে আমান করেছে, হঠকারী পাণ্ডিতদের কথামত কাজ করেছে। যার ফলে দুনিয়াতে তাদের প্রতি গণব নাযিল হয়েছে এবং আযবেরও অভিশপ্ত আযাবে নিষ্কিণ্ড হবে।

এখানে বোঝা যায় যে, ‘আদ জাতি বাড়-তুফানের কবলে পড়িত হয়েছিল। কিন্তু ‘সূরা মুমিনুন’-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ভয়ঙ্কর গর্জন তারা ধ্বংস হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হয়ত উভয় প্রকার আযবই নাযিল হয়েছিল। প্রথমে বাড় তুফান শুরু হয়েছিল, চরম পর্যায়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছিল।

৬১ থেকে ৬৮ পর্যন্ত ৮ আয়াতে হযরত সালেহ (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যিনি ‘আদ জাতির দ্বিতীয় শাখা ‘কওমে সামুদ’-এর প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনিও তাঁর কওমকে সর্বপ্রথম তওহীদের দাওয়াত দিলেন। দেশবাসী তা প্রত্যখ্যান করে বলল—“এ পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ড থেকে আমাদের সম্মুখে আপনি যদি একটি উষ্ট্রী বের করে দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মানতে রাজী আছি।”

হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, তোমাদের চাহিদা মোতাবেক মু’জেযা প্রদর্শনের পরেও তোমরা যদি ইয়ন আনতে দ্বিধা প্রকাশ কর, তাহলে কিন্তু আল্লাহ তাআলার বিধান অনুসারে তোমাদের উপর আযাব নেমে আসবে, তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এতদসঙ্গেও তারা নিজদের হঠকারিতা থেকে বিরত হল না। আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম ক্রুরতে তাদের চাহিদা মোতাবেক মু’জেযা জাতি করলেন। বিশাল প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তাদের কবিত গুণাবলী সম্পন্ন উষ্ট্রী আত্ম-প্রকাশ করল। আল্লাহ তাআলা হুকুম দিলেন যে, এ উষ্ট্রীকে কেউ যেন কোনরূপ কষ্ট-ক্লেশ না দেয়। যদি এরূপ করা হয় তবে তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল হয়ে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিষেধ মোতামান করল, উষ্ট্রীকে হত্যা করল। তখন আল্লাহ তাআলা কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। হযরত সালেহ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণ নিরাপদে রক্ষা পেলেন। অন্য সবাই এক ভয়াবহ গর্জনে ধ্বংস হল। অর ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সালেহ (আঃ)-এর জাতি তাঁকে বলল

قَدْ كُنْتُمْ فِينَا مَرْجُؤًا قَلِيلًا هَذَا

অর্থাৎ, “তওহীদের দাওয়াত ও প্রতিশ্রুতি পূজা থেকে আমাদের বারণ করার আগ পর্যন্ত আপনার সম্পর্কে আমরা উচ্চাশা পোষণ করতাম যে, আপনি আগামীতে আমাদের নেতৃত্ব দান করবেন।” এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা বাল্যকাল হতেই নবীপদকে যোগ্যতা ও উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী করে থাকেন। যার ফলে সবাই তাঁদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হতো। যেমন হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওয়ত ঘোষণা করার পূর্বে সমস্ত আরববাসী তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মনে করত, এবং ‘আল-আমীন’ উপাধিতে ডুমিত করেছিল। কিন্তু নবুওয়তের দাবী ও মুর্তি পূজা থেকে বারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেসব লোক তাঁর বিরোধিতা ও শত্রুতা শুরু করেছিল।

আনুযঙ্গিক জাতীয় বিষয়

قَمَرٌ مِّن دَارِكُمْ لَكُمْ آيَةٌ هَذَا

অর্থাৎ, তারা যখন আল্লাহর নিষেধ মোতামান লঙ্ঘন করে অলৌকিক উষ্ট্রীকে হত্যা করল, তখন তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হল যে, মাত্র তিন দিন তোমাদিগকে অবকাশ দেয়া হল, এ তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ অবকাশের তিন দিন ছিল



কৃপা, গুণ ও শনিবার। রবিবার প্রত্যুবে তাদের উপর আযাব নাফিল হল।

وَأَنذَرْنَا أَيْدِيَهُمْ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَوَّافًا ۝۱۱  
অর্থাৎ, ঐ পাপিষ্ঠদেরকে এক ভয়ঙ্কর গর্জন এসে পাকড়াও করল। এ ছিল হযরত জিবরাঈল (আঃ)—এর গর্জন, যা হাজার হাজার বজ্রধ্বনির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও ভয়াবহ। যা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষ বা কোন জীবজন্তুর হতে পারে না। এরূপ প্রাণ ঈলাগে গর্জনেই সকলে মৃত্যুবরণ করেছিল।

ঐর আয়াতের মর্মার্থ থেকে বোঝা যায় যে, ‘কওমে-সামূদ’ ভয়ঙ্কর গর্জনে ধ্বংস হয়েছিল। অপর দিকে সূরা আ’রাফ’—এর এক আয়াতে এরূপাদি হয়েছে— وَأَنذَرْنَا كَوْمًا مِّنَ الضَّالِّينَ ۝۱ ‘অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল।’ এতে বোঝা যায় যে, ভূমিকম্পের ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইহাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, উভয় আয়াতের মর্মার্থে কোন বিরোধ নেই। হযরত প্রথমে ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল। এবং তৎসঙ্গেই ভয়ঙ্কর গর্জনে সবাই ধ্বংস হয়েছিল।

এখানে হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ (আঃ)—এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সন্তান লাভের সু-সংবাদ দেয়ার জন্য তাঁর কাছে কতিপয় ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)—এর স্ত্রী বিবি সারা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সন্তানের জন্য একান্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন; কিন্তু উভয়ের বার্ষিকের চরম সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে দৃশ্যতঃ সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে সুসংবাদ দান করলেন যে, তাঁরা অচিরেই একটি পুত্রসন্তান লাভ করবেন। তাঁর নামকরণ করা হল ইসহাক। আরো ঘোষিত করা হল যে, হযরত ইসহাক (আঃ) দীর্ঘ জীবী হবেন, সন্তান লাভ করবেন, তাঁর সন্তানের নাম হবে ‘ইয়াকুব’ (আঃ)। উভয়ে নবুওয়তের মর্মান্বয় অভিব্যক্ত হবেন।

ফেরেশতাগণ মানবাকৃতিতে আগমন করায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদেরকে সাধারণ আগন্তুক মনে করে মেহমানদারীর আয়োজন করেন। ভূনা গোষ্ঠিত সামনে রাখলেন। কিন্তু তারা ছিলেন ফেরেশতা, পানাহারের উর্ধে। কাজেই সম্পূর্ণ আহ্ব্য দেখেও তারা সেদিকে হাত বাড়াইলেন না। ঐটা লক্ষ্য করে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আতঙ্কিত হলেন যে, হযরত এদের মনে কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে। ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)—এর ঘমূলক আশঙ্কা অন্দাজ করে উহা দূর করার জন্য স্পষ্টভাবে জানানলেন যে, ‘আপনি শঙ্কিত হবেন না। আমরা আল্লাহ্ ফেরেশতা, আপনাকে একটি সুসংবাদ দান করা ও অন্য একটি বিশেষ কার্য সম্পাদানের জন্য আমরা প্রেরিত হয়েছি। তা হচ্ছে হযরত লূত (আঃ)—এর কওমের উপর আযাব নাফিল করা।’ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)—এর স্ত্রী বিবি সারা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন যে, এরা মানুষ নন, ফেরেশতা; তখন পর্দার প্রয়োজন রইল না। বৃদ্ধকালে সন্তান লাভের সু-খবর শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন, এহেন বৃদ্ধ বয়সে আমার গর্ভে সন্তান জন্ম হবে! আর আমার এ স্বামীও তো অতি বৃদ্ধ। ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন, তুমি কি আল্লাহ্ ইচ্ছার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করছ? ঠাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। বিশেষ করে তোমরা নবী পরিবারের লোক। তোমাদের পরিবারের উপর আল্লাহ্ তাআলার প্রভূত রহমত এবং অকুণ্ঠ বরকত রয়েছে। বাহ্যিক কার্য-কারণের উর্ধে বহু অলৌকিক ঘটনাবলী তোমরা নিজ চোখে অবলোকন করছ। তা সত্ত্বেও বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ আছে কি? এ হচ্ছে ঘটনার সংক্ষিপ্তসার। এবার

আয়াতসমূহের বিস্তারিত আলোচনায় আসা যাক।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)—এর নিকট কোন সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। এই সুসংবাদের বিবরণ সামনের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে: فَيَرُؤُهُ يَمْسُكُ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—ফেরেশতার দলে হযরত জিবরাঈল (আঃ), হযরত মীকায়ীল (আঃ) ও ইয়াক্বীল (আঃ) এ তিন জন ফেরেশতা ছিলেন— (কুরতুবী) তাঁরা মানবাকৃতিতে আগমন করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)—কে সালাম করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যথারীতি সালামের জবাব দিলেন এবং তাদেরকে মানুষ মনে করে আতিথেয়তার আয়োজন করলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)—ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মেহমানদারীর প্রথা প্রবর্তন করেন— (কুরতুবী) তাঁর নিয়ম ছিল যে, মেহমান ছাড়া একাকী কখনো খানা খেতেন না। খাবার সময় খোঁজ করে মেহমান নিয়ে এসে সাথে খেতে বসতেন।

তফসীরে কুরতুবীতে ইব্রাহীমী সূত্র উদ্ধৃত করে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একদিন তাঁর সাথে খানা খাওয়ার জন্য মেহমান তালাশ করছিলেন। এমন সময় জনৈক অচেনা লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। যখন খানা খেতে শুরু করবেন, তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আগন্তুক মুসাফিরকে বললেন—“বিসমিল্লাহ্—আল্লাহ্ নামে আরম্ভ করছি বল।” সে বলল—“আল্লাহ্ কাকে বলে আমি জানি না।” হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রাগান্বিত হয়ে তাকে দস্তুরখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। যখন সে বের হয়ে গেল, তৎক্ষণাত হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপস্থিত হলেন এবং জানানলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন—আমি তার কুফরী সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সারা জীবন তাকে আহ্ব্য-পানীয় দিয়ে আসছি। আর আপনি একে এক বেলা খাবার দিতে পারলেন না। একথা শোনা মাত্র হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঐ লোকটির তালাশ ছুটলেন। অবশেষে তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি বৈকে বসল এবং বলল, “আপনি প্রথমে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, পরে আবার সাধাসাধি করে আনতে গেলেন কেন? এ কারণ না জানা পর্যন্ত আমি খাদ্য স্পর্শ করব না।”

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করলেন। কাকের লোকটির মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হল। সে বলল— যে মহান পালনকর্তা ফেরেশতা প্রেরণ করে আপনাকে একথা জানিয়েছেন, তিনি সত্যই পরম দয়ালু। আমি তার প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর সে বিসমিল্লাহ বলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)—এর সাথে খানা খেতে আরম্ভ করল।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর আতিথেয়তার অভ্যাস অনুযায়ী আগন্তুক ফেরেশতাগণকে মানুষ মনে করে অনতিবিলম্বে একটি বাছুর গরু জবেহ করলেন এবং উহা ভূনা করে মেহমান ফেরেশতাগণের আহ্ব্যের জন্য তাদের সামনে রাখলেন।

৭০ তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, আগন্তুক ফেরেশতাগণ যদিও মানবাকৃতিতে আগমন করেছিলেন এবং মানবসুলত পানাহারের বেশিষ্টা তাদেরকে দান করা যদিও সম্ভব ছিল। কিন্তু পানাহার না করার মধ্যেই হেঁকমত নিহিত ছিল, যেন তাঁদের ফেরেশতা হওয়া প্রকাশ পায়। কাজেই মানবাকৃতি সত্ত্বেও তাঁদের পানাহার না করায় ‘ফেরেশতা স্বভাব’ বজায় রাখা হয়েছিল। যার ফলে তাঁরা আহ্ব্যের দিকে হাত বাড়ান নাই।

কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, ফেরেশতাদের হাতে কিছু তীর

قَالُوا الصَّيِّبُ مِنَ امْرِئِ اللَّهِ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِئَابُ عَدُنِمْ اِهْلًا
الْبَيْتِ اِنَّهُمْ حَصِيدٌ بَحِيحٌ قَالُوا ذَهَبَ عَنْ اَنْبِئِهِمْ الرُّوحُ
وَجَاءَتْهُ الْبُرْءَىٰ بِجَادِ لَنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۗ اِنَّ اَنْبِئِهِمْ
لَحَلِيمٌ اَوْ اَوْاهٌ مُّبِينٌ ۗ يَا اَنْبِئِهِمْ اَعْرَضُ عَنْ هَذَا ۗ اِنَّهُ قَدْ
جَاءَ اَمْرٌ رَبِّيكَ ۗ وَارْتَبِعْ اَتِيَهُمْ عَذَابٌ عَزِيزٌ ۗ وَاَنْتُمْ
جَاءَتْ رُسُلًا لُوطًا يَمِيٓنُ يَوْمَهُمْ ذُرْعًا وَقَالَ هٰذَا
يَوْمٌ مَّحْصِيۢمٌ ۗ وَاٰتٰهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ
كَانُوْا يَعْبٰلُوْنَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَوْمَهُمْ هُوَ لَآءٌ لِّبَنَاتِكُمْ اَلَمْ
لَكُمْ فَانْقَرُوا لِلَّهِ وَلَا تَخْزُوْنَ فِي صَحْبِيۙ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ
رَشِيۢدٌ ۗ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَيۜقٍ
وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُنَّ مَا تَبْرُوۡنَ ۗ قَالَ لَوَاۡنِ لِيۙ لَكُمْ قُوَّةٌ اَوْ
اٰوِيۙ اِلٰى رُبِّنَّ سَيِّدِيۙ ۗ قَالُوا لِيٰوِيۙ لُوطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ
لَنْ يَصِلُوْا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الْاَيْلِ وَلَا
يَلْقَيْتُ مِنْكُمْ اَحَدًا ۗ اَلَا اَمْرًا تَكُ اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا اَصَابَهُمْ
اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيۢبٍ ۗ ۝

(৭৩) তারা বলল—তুমি আল্লাহ্র হুকুম সম্পর্কে বিস্ময়বোধ করছ? হে গৃহবাসীরা, তোমাদের উপর আল্লাহ্র রহমত ও প্রভূত বরকত রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্র প্রশংসিত মহিমায। (৭৪) অতঃপর যখন ইব্রাহীম (আঃ) এর আতঙ্ক দূর হল এবং তিনি সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি আমার সাথে তর্ক শুরু করলেন কণ্ঠে লূত সম্পর্কে। (৭৫) ইব্রাহীম (আঃ) বড়ই যৈশীল, কোমল অন্তর, আল্লাহমুখী সন্দেহ নেই। (৭৬) ইব্রাহীম, এখেন ধারণা পরিহার কর; তোমার পালনকর্তার হুকুম এসে গেছে, এবং তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই আপতিত হবে, যা কখনো প্রতিহত হবার নয়। (৭৭) আর যখন আমাদের ঐরিত ফেরেশতাগণ লূত (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হল। তখন তাঁদের আগমনে তিনি দৃঢ়প্রজ্ঞ হলে এবং তিনি বলতে লাগলেন—আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। (৭৮) আর তাঁর কণ্ঠের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর (গৃহ) পানে ছুটে আসতে লাগল। পূর্ব থেকেই তারা কু-কর্মে ভংগন ছিল। লূত (আঃ) বললেন—‘হে আমার গণ্ডম, এ আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতমা। সুতরাং তোমার আল্লাহকে ভয় কর, এবং অতিধিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না, তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই। (৭৯) তারা বলল—তুমি তো জানই, তোমার কন্যাদের নিয়ে আমাদের কোন গরজ নেই। আর আমরা কি চাই, তাও তুমি অবশ্যই জান। (৮০) লূত (আঃ) বললেন—হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম। (৮১) যেহান ফেরেশতাগণ বলল—হে লূত (আঃ) আমরা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে ঐরিত পেরেশতা। এরা কখনো তোমার দিকে পৌছতে পারবে না। ব্যস তুমি কিছুটা রাত থাকতে থাকতে নিজের লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যাও। আর তোমাদের কেউ খেন পিছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রী নিশ্চয় তার উপরও তা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। ভোর বেলাই তাদের প্রতিশ্রুতির সময়, ভোর কি খুব নিকটে নয়?

ছিল। তাঁরা উহার ফলক দ্বারা ভূনা গোশত স্পর্শ করছিলেন। তাঁদের এহেন আচরণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সন্ধিগ্ন ও শঙ্কিত হলেন। কারণ, সে দেশে নিয়ম ছিল যে, অসদৃশ্যে কেউ কারো বাড়ীতে যেহান হলে সেখানে পানাহার করত না। (তফসীরে কুরতুবী) অবশেষে ফেরেশতাগণ প্রকাশ করে দিলেন যে, আপনি ভীত হবেন না। আমরা মানুষই নই, বর আল্লাহ্র ফেরেশতা।

### আহকাম ও মাসায়েল

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামী আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত দেয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তদীয় তফসীরে যার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

সালামের সূনত : **قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ** “তারা সালাম বললেন, তিনিও বললেন সালাম।” এতদুরা বোঝা যায় যে, মূলসমানদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ-মোলাকাতের সময় পরস্পরকে সালাম করা কর্তব্য। আরো জানা গেল যে, আগন্তুক ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে, অন্যরা উত্তর জবাব দেবে—এটাই বাঞ্ছনীয়।

পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎকালে বিশেষ কোন বাক্য উচ্চারণ করে একে অপরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার রীতি পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। তবে এ ব্যাপারেও ইসলামের শিক্ষা অনন্য ও সর্বোত্তম। কেননা সালামের সূনত সস্মত বাক্য **عليكم السلام**—এর মধ্যে সর্বপ্রথম ‘আস-সালামু’ আল্লাহ্র একটি গুণ বাচক নাম হওয়ার কারণে আল্লাহ্র যিকর করা হল, সযোষিত ব্যক্তির জন্য সালামতি ও নিরাপত্তার দোয়া করা হল, নিজের পক্ষ হতে তার জান-মাল ইচ্ছতের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হল।

এখানে কোরআন পাকে ফেরেশতাদের পক্ষ হতে **سَلَامًا** ‘সালামাম’ এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর তরফ হতে শুধু **سَلَامٌ** ‘সালামুন’ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে সালাম ও জবাবের পূর্ণ বাক্য উল্লেখ করা নিশ্চয়োজন মনে করা হয়েছে। কার্যতঃ অবশ্য এখানে উভয়ক্রমে সূনত মোতাবেক সালাম জবাবের পূর্ণ বাক্যই বোঝানো হয়েছে। হযরত রসুলে করীম (সঃ)ও নিজের আচরণের মাধ্যমে সালামের পূর্ণ বাক্য শিক্ষা দান করেছেন। অর্থাৎ, প্রথম পক্ষ আস-সালামু আলাইকুম বলবে, তদুত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ ‘ওয়া-আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমতুল্লাহ’ বলবে।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হুদে পূর্ববর্তী অধিকাংশ আয়িয়াযে কেলাম (আঃ) ও তাঁদের উষ্মতাগণের কাহিনী ও নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আসমানী আযাব অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত লূত (আঃ) ও তাঁর দেশবাসীর অবস্থা ও দেশবাসীর উপর কঠিন আযাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

হযরত লূত (আঃ) এর গণ্ডম একে তো কাফের ছিল, অধিকন্তু তারা এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অন্যাচারে লিপ্ত ছিল, যা পূর্ববর্তী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় নাই, বন্য পশুরাও যা ঘৃণা করে থাকে। অর্থাৎ, পুরুষ কর্তৃক অন্য পুরুষের সাথে মৈথুন করা। ব্যক্তিকারে চেয়েও ইহা জঘন্য অপরাধ। এ জন্যই তাদের উপর এমন কঠিন আযাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা অন্য কোন অপকর্মকারীদের উপর কখনো অবতীর্ণ হয় নাই।

হযরত লূত (আঃ)—এর ঘটনা যা অত্র আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত জিব্রাইল (আঃ) সহ কতিপয় ফেরেশতাকে কণ্ঠে লূতের উপর আঘাত নাযিল করার জন্য প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে তাঁরা ফিলিস্তীনে প্রথমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)—এর সন্নিপাতে উপস্থিত হন।

আল্লাহ তাআলা যখন কোন জাতিকে আঘাত দ্বারা ধ্বংস করেন, তখন তাদের কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আঘাতই নাযিল করে থাকে। এ ক্ষেত্রেও ফেরেশতাগণকে নওজোয়ানরূপে প্রেরণ করেন। হযরত লূত (আঃ) ও তাঁদেরকে মানুষ মনে করে তাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হলে। কারণ মেহমানের আতিথেয়তা নবীর নৈতিক দায়িত্ব। পক্ষান্তরে দেশবাসীর কু-স্বভাব তাঁর অজানা ছিল না। উভয় সংকেটে পড়ে তিনি স্বগতোক্তি করলেন—“আজকের দিনটি বড় সংকটময় দিন।”

আল্লাহ জালা শানুহ্ এ দুনিয়াকে আজব শিক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন। যার মধ্যে তাঁর অসীম কুদরত ও অফুরন্ত হেকমতের ভূরি ভূরি নিদর্শন রয়েছে। মূর্তিপূজারী আঘরের গৃহে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ)—কে পয়সা করেছেন। হযরত লূত (আঃ)—এর মত একজন বিশিষ্ট পয়গম্বরের স্ত্রী নবীর বিরুদ্ধাচরণ করে কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত। সম্মানিত ফেরেশতাগণ সুলর্ন নওজোয়ান আকৃতিতে যখন হযরত লূত (আঃ)—এর গৃহে উপনীত হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী সমাজের দুষ্ট লোকদেরকে স্ববর দিল যে, আজ আমাদের গৃহে এরূপ মেহমান আগমন করেছে।—(কুরতুবী ও মাযহারী)

হযরত লূত (আঃ)—এর আশঙ্কা যথার্থ প্রমাণিত হল। যার বর্ণনা ৭৮ নং আয়াতে দেখা হয়েছে وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُمْ لِيَكْفُرُوا بِهِمْ وَيَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ “আর তাঁর কণ্ঠের লোকেরা আত্মহার্য হয়ে তাঁর গৃহপানে ছুটে এল। আর আগে থেকেই তারা কু-কর্মে অভ্যস্ত ছিল।”

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জঘন্য কু-কর্মের প্রভাবে তারা এতদূর চরম নির্লজ্জ হয়েছিল যে, হযরত লূত (আঃ)—এর মত একজন সম্মানিত পয়গম্বরের গৃহ প্রকাশ্যভাবে অবরোধ করেছিল।

হযরত লূত (আঃ) যখন দেখলেন যে, তাদেরকে প্রতিরোধ করা দুষ্কর, তখন তাদেরকে দুষ্কৃতি হতে বিরত রাখার জন্য তাদের সর্দারদের নিকট স্বীয় কন্যাদের বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। তৎকালে কাফের গত্রের সাথে মুসলিম পাত্রীর বিবাহ-বন্ধন বৈধ ছিল। হুযুরে আকরাম (সাঃ)—এর প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এ হুকুম বহাল ছিল। এ জন্যই হযরত (সাঃ) স্বীয় দুই কন্যাকে প্রথমে উত্তরা ইবনে আবু লাহাব ও আবুল আস ইবনে রবী’র কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। অথচ তখন তারা উভয়ে কুফরী ফলতে ছিল। পরবর্তীকালে ওহীর মাধ্যমে কাফেরের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ হারাম ঘোষণা হয়।—(কুরতুবী)

কোন কোন তফসীরকারের মতে—এখানে হযরত লূত (আঃ) নিজের কন্যা দ্বারা সমগ্র জাতির বধু কন্যাদের বৃক্ষিয়েছেন। কেননা, প্রত্যেক নবী নিজ উ-ম্মতের জন্য পিতৃতুল্য এবং উ-ম্মতগণ তাঁর রূহানী সন্তানস্বরূপ।

যেমন কোরআনের ২১ পারা সূরা আহযাবের ৬ষ্ঠ আয়াত اَللّٰهُ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ اَتَمَّهُمْ

এর সাথে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)—এর ক্বেরাতে لهم و هو اب وাকেও বর্ণিত আছে। যার মধ্যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)—কে সমগ্র “উ-ম্মতের পিতা” বলে অভিহিত করা হয়েছে। অত্র তফসীর অনুসারে হযরত লূত (আঃ)—এর

কথার অর্থ হল, তোমরা নিজের কদাচার হতে বিরত হও এবং ভদ্রভাবে কণ্ঠের কন্যাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বৈধভাবে স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর।

অতঃপর হযরত লূত (আঃ) তাদেরকে আল্লাহর আঘাবের ভীতি প্রদর্শন করে বললেন فَاتَّخَذُوا اللّٰهَ “আল্লাহকে ভয় কর” এবং কাকূতি-মিনতি করে বললেন—وَلَا تَحْزُنُوْنِ فِيْ صَيْفِيْ “আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না।” তিনি আরো বললেন—اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ “তোমাদের মাঝে কি কোন ন্যায়নিষ্ঠ ভাল মানুষ নেই? আমার আকুল আবেদনে যার অন্তরে এতটুকু করুণার সৃষ্টি হবে।

কিন্তু তাদের মধ্যে শালীনতা ও মনুষ্যত্বের লেশমাত্র ছিল না। তারা একযোগে বলে উঠল—“আপনি তো জানেনই যে, আপনার বধু-কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আর আমরা কি চাই, তাও আপনি অবশ্যই জানেন।”

লূত (আঃ) এক সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন—হায়, আমি যদি তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হতাম, অথবা আমার আত্মীয়-স্বজন যদি এখানে থাকত, যারা এই জ্বালেমদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতো, তাহলে কত ভালো হতো।

ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আঃ)—এর অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে প্রকৃত রহস্য ব্যক্ত করলেন এবং বললেন—আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনার দলই সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। আমরা মানুষ নই, বরং আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা। তারা আমাদেরকে কাবু করতে পারবে না বরং আঘাত নাযিল করে দুরাত্মা-দুরাচারদের নিপাত সাধনের জন্যই আমরা আগমন করেছি।

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “আল্লাহ তাআলা হযরত লূত (আঃ)—এর উপর রহম করন, তিনি নিরুপায় হয়ে সুদৃঢ় জামাতের আশ্রয় কামনা করেছিলেন।” তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত লূত (আঃ)—এর পরবর্তী প্রত্যেক নবী সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।—(কুরতুবী) স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)—এর বিরুদ্ধে কোরাইশ-কাফেরগণ হাজার রকম অপচেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাঁর হাশেমী গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে তাঁকে আশ্রয় ও পুষ্টপোষকতা দান করেছে, যদিও ধর্ম-মতের দিক দিয়ে তাদের অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করত। এ জন্যই সম্পূর্ণ বনী-হাশেম গোত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সাথে शामिल ছিল। যখন কোরাইশ কাফেররা তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের দানা-পানি বন্ধ করে দিয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দুর্বৃত্তরা যখন হযরত লূত (আঃ)—এর গৃহদ্বারে সমবেত হল, তখন তিনি গৃহদ্বার রুদ্ধ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ গৃহে অবস্থান করছিলেন। আড়াল হতে দুষ্টদের কথাবার্তা চলছিল। তারা দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ এবং কপাট ভাঙতে উদ্যোগী হল। এমন সংগীন মুহুর্তে হযরত লূত (আঃ) পূর্বোক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে অভয় দান করলেন এবং গৃহদ্বার খুলে দিতে বললেন। তিনি দুয়ার খুলে দিলেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) ওদের প্রতি তাঁর পাখার ঝাপটা দিলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল এবং ভাগতে লাগল।

হুদ

২২২

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاقًا وَقَالُوا مَطَرْنَا عَلَيْهَا  
 حَصَارًا فَذُوقُوا مِنْ سَيْحِيلٍ مَمْضُودٍ مَسُومَةٍ عِنْدَ رَبِّكَ وَ  
 مَا هِيَ مِنَ الظَّلِيمِينَ بَعِيدٍ ۝ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا  
 قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ الْعُزَّةِ وَلَا  
 تَتَّبِعُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ إِنَّ أَرْكَمَكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنَّ  
 أَخَافَكُمْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝ وَيَقَوْمِ أَوْشًا  
 الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْيَهُودَ  
 وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ بِقِيَّتِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ  
 كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝ قَالُوا لَشُعَيْبٍ  
 أَسْلَمْنَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يُعْبَدُ آبَاؤَنَا وَإِنَّا لَفَعَلْنَا  
 فِي الْأُمَمِ مِمَّا نَشْتَوِي أَنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ ۝ قَالَ  
 يٰقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ سَيِّئَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ  
 رِزْقًا حَسَنًا وَمَأْرُؤِي إِن أَنَا لَفَكْرٌ إِلَىٰ مَا أَهْتَكُم  
 عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا  
 تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ۝

(৬২) অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর-পাথর বর্ষণ করলাম। (৬৩) যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল। আর সেই পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়। (৬৪) আর মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েব (আঃ)-কে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন— হে আমার কণ্ঠ্য! আল্লাহর বন্দগী কর, তিনি ছাড়া আমাদের কোন মাবুদ নাই। আর পরিমাপে ও ওজননে কম দিও না, আজ আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থায়ই দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের উপর এমন একদিনের আযাবের আশঙ্কা করছি যেদিনটি পরিবেষ্টনকারী। (৬৫) আর হে আমার জাতি, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনরূপ ক্ষতি করো না, আর পৃথিবীতে ফাসাদ করে বেড়াবে না। (৬৬) আল্লাহ প্রদত্ত উদ্ধৃত তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা ঈমানদার হও, আর আমি তো তোমাদের উপর সদা পর্যবেক্ষণকারী নই। (৬৭) তারা বলল— হে শোয়ায়েব (আঃ), আপনার নামায় কি আপনাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদার যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাস মহৎ ব্যক্তি ও সংপথের পথিক। (৬৮) শোয়ায়েব (আঃ) বললেন— হে দেশবাসী, তোমরা কি মনে কর। আমি যদি আমার পরওয়ারদেরের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীলের উপর কায়ম থাকি আর তিনি যদি নিজের তরফ হতে আমাকে উত্তম রিখিক দান করে থাকেন, (তবে কি আমি তাঁর হুকুম অমান্য করতে পারি?) আর আমি চাই না যে— তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হব, আমি তো যথাসাধ্য শোষণাতে চাই। আল্লাহর মদদ দুরাই কিন্তু কাঙ্ক্ষ হয়ে থাকে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই।

তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার নির্দেশক্রমে হযরত লুত (আঃ)-কে বললেন— আপনি কিছুটা রাত থাকতে আপনার লোকজনসহ এখান থেকে অন্যত্র সরে যান এবং সবাইকে সতর্ক করে দিন যে, তাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, তবে আপনার স্ত্রী ব্যতীত। কারণ, অন্যদের উপর যে আযাব আপতিত হবে, তাকেও সে আযাব জোম করতে হবে।

ইহার এক অর্থ হতে পারে যে, আপনার স্ত্রীকে সাথে নেন না। (দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, তাকে পিছনে ফিরে চাইতে নিষেধ করবেন না।—(অনুবাদক)। আরেক অর্থ হতে পারে যে, সে আপনার হৃদয়স্বরূপ যেনে চলবে না।

কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, তাঁর স্ত্রীও সাথে যাচ্ছিল। কিন্তু পাপিষ্ঠদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাটা শুনে পশ্চাতে ফিরে তাকাল এবং কণ্ঠ্যের শোচনীয় পরিণতি দেখে দৃষ্ট প্রকাশ করতে লাগল। তৎক্ষণাৎ একটি প্রস্তরের আঘাতে সেও অন্ধা পেল।—(ফুরত্বী ও মাযহারী)

ফেরেশতার আরাে জানিয়ে দিলেন যে, **إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الضُّبَيْرُ** প্রত্যক্ষকালেই তাদের উপর আযাব আপতিত হবে। হযরত লুত (আঃ) বললেন— “আমি চাই, আরো জলদি আযাব আসুক।” ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন **إِنَّ الضُّبَيْرَ بِقَرْبٍ** : “প্রত্যক্ষকাল দূরে নয়, বরং সমাগম প্রায়।”

#### আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অন্তঃপর উক্ত আযাবের ধরন সম্পর্কে কোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে—যখন আযাবের হুকুম কার্যকরী করার সময় হল, তখন আমি তাদের বসতির উপরিভাগকে নীচে করে দিলাম এবং তাদের উপর অবিশ্রান্তভাবে এমন পাথর বর্ষণ করলাম, যার প্রত্যেকটি পাথর একজনের নামে চিহ্নিত ছিল।

বর্ণিত আছে যে, চারটি বড় বড় শহরে তাদের বসতি ছিল। ঐসব জনপদকেই কোরআন পাকের অন্য আয়াতে **وَالْوَيْفُؤَاتِ** ‘মুতাক্ফাত’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত জিব্রীল (আঃ) তাঁর পাখা উক্ত শহর চতুর্দিকের যমীনের তলদেশে ধরিত করতঃ এমনভাবে মহাশূন্যে উত্তোলন করলেন যে, সবকিছু নিষ্ক স্থানে স্থির ছিল। এমনকি পানি ভর্তি পাত্র হতে এক বিন্দু পানিও পড়ল না বা নড়ল না। মহাশূন্য হতে কুকুর জানোয়ার ও মানুষের চিৎকার ভেদে আসছিল। ঐসব জনপদকে সোজাভাবে আকাশের দিকে তুলে উলটিয়ে যথাস্থানে নিক্ষেপ করা হল। তারা আল্লাহর আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উলটিয়েছিল, তাই এটা ছিল তাদের উপযুক্ত শাস্তি।

হযরত লুত (আঃ)-এর নাফরমান জাতির শোচনীয় পরিণতি বর্ণন করার পর দুনিয়ার অপরাধের জাতিতে সতর্ক করার জন্য এরশাদ হয়েছে — **وَمَا هِيَ مِنَ الظَّلِيمِينَ بَعِيدٍ** প্রস্তর বর্ষণের আযাব বর্তমানকালের জালেমদের থেকেও দূরে নয়। বরং কোরাইশ কাকফেরদের জন্য ঘটনাস্থল ও ঘটনাকাল খুবই কাছে এবং অন্যান্য পাপিষ্ঠরাও যে নিজেদেরকে এহেন আযাব হতে দূরে মনে না করে। রসুলে করীম (শঃ) এরশাদ করেছেন, “আমার উম্মতের কিছু লোক কণ্ঠ্যের লুতের অপকর্মা

লিপ্ত হবে। যখন এরূপ হতে দেখবে, তখন তাদের উপরও অনুরূপ আযাব আসার অপেক্ষা কর।”

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) ও তাঁর কণ্ডমের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। তারা কুফরী ও শেরেকী ছাড়া ওজনে-পরিমাণেও লোকদের ঠকাতো। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন এবং ওজনে কম-বেশী করতে নিষেধ করলেন। আল্লাহর আযাবের ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও না-ফরমানীর উপর অটল রইল।

وَإِلَّا مَدَّيْنِ ﴿١٠٧﴾  
 وَأَمَّا كَثِيرٌ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٨﴾  
 ‘আর আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইব (আঃ)-কে প্রেরণ করছি।’ ‘মাদইয়ান’ আসলে একটি শহরের নাম। মাদইয়ান ইবনে ইব্রাহীম ইহার পুত্রন করেছিলেন। সিরিয়ার বর্তমান معان ‘মোয়ান’ নামক স্থানে উহা অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। উক্ত শহরের অধিবাসীগণকে মাদইয়ানবাসী বলার পরিবর্তে শুধু “মাদইয়ান” বলা হত। আল্লাহ তাআলার বিশিষ্ট পয়গম্বর হযরত শোয়ায়েব (আঃ) উক্ত মাদইয়ান কণ্ডমের লোক ছিলেন তাই তাঁকে “তাদের ভাই” বলা হয়েছে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করে তাদের স্বজাতির এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করলেন, যেন তাঁর সাথে জানাশোনা থাকার কারণে সহজেই তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে।

قَالَ يٰٓأَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ وَاللّٰهُ مَا كُنتُمْ مِنَ الْوٰعِيْنَ وَلَا كُنتُمْ مِّنَ الْوٰكِلِيْنَ ﴿١٠٩﴾  
 ‘তিনি বললেন— হে আমার জাতি! তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের মাবুদ হওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। আর তোমরা ওজনে ও পরিমাণে কম দিও না।’ এখানে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) নিজ জাতিকে প্রথমে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানালেন। কেননা, তারা ছিল মুশরেক, গাছপালার পূজা করত। এজন্যই মাদইয়ানবাসীকে ‘আসহাবুল-আইকা’ বা ‘জঙ্গলওয়াল’ উপাধি দেয়া হয়েছে। এহেন কুফরী ও শেরেকীর সাথে সাথে আরেকটি মারাত্মক দোষ ও জঘন্য অপরাধ ছিল যে, আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয় কালে ওজনে-পরিমাণে হের-ফের করে লোকের হক আত্মসাৎ করত। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন।

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, কুফরী ও শেরেকীই সকল পাপের মূল। যে জাতি ইহাতে লিপ্ত, তাদেরকে প্রথমই তওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়। ঈমান আনয়নের পূর্বে আমল ও কায-কারবারের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না। দুনিয়াতে তাদের সফলতা অথবা ব্যর্থতাও শুধু ঈমান বা কুফরীর ভিত্তিতে হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে আমলের কোন দখল থাকে না। কোরআন পাকে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণের ও তাঁদের জাতিসমূহের ঘটনাবলী ইহার প্রমাণ। তবে শুধু দুইটি জাতি এমন ছিল, যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কুফরীর সাথে সাথে তাদের বদ-আমলেও দখল ছিল। প্রথম, হযরত লূত (আঃ)-এর জাতি যাদের কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের কুফরী ও গর্হিত অপকর্মের কারণে তাদের বসতিকে উলটিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কণ্ডম। যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার জন্য কুফরী ও মাণে কম দেয়াকে কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

এতে করে বোঝা যায় যে, পুণ্ডিমখুন ও মাণে কম দেয়া আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ। কারণ ইহা এমন

দু’টি কার্য যার ফলে সমগ্র মানব জাতির চরম সর্বনাশ সাধিত এবং সারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

ওজন-পরিমাণে হের-ফের করার হীন মানসিকতা দূর করার জন্য হযরত শোয়ায়েব (আঃ) প্রথমে স্বীয় দেশবাসীকে পয়গম্বরসুলভ স্নেহ ও দরদের সাথে বললেন  
 اِنِّىۡ اَرٰسُكُمْ بِخَيْرٍ وَّرٰى اٰخٰتٌ عَلَيْهِمْ عَدَابٌ يُّوْمٍ ﴿١١٠﴾  
 ‘বর্তমানে আমি তোমাদের অবস্থা খুব ভাল ও সচ্ছ দেখছি। তৎক্ষণাতর আশ্রয় গ্রহণ করার মত কোন কারণ দেখি না। তাই আল্লাহ তাআলার এ অনুগ্রহে শোকর আদায় করার জন্য হলেও তোমাদের পক্ষে তাঁর কোন সৃষ্ট জীবকে ঠকানো উচিত নয়। তোমরা যদি আমার কথা না শোন, আমার নিষেধ অমান্য কর, তাহলে আমার ভয় হয় যে, আল্লাহর আযাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এখানে আশ্চর্যের আযাব বোঝানো হয়েছে, দুনিয়ার আযাবও হতে পারে, আবার দুনিয়ার আযাব বিভিন্ন প্রকারও হতে পারে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন আযাব হচ্ছে, তোমাদের স্বচ্ছলতা খতম হয়ে যাবে, তোমরা অভাবগ্রস্ত দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে। যেমন রসুলে করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন—“যখন কোন জাতি মাণে কম দিতে শুরু করে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধিজনিত শাস্তিতে পতিত করেন।”

ওজন-পরিমাণে কম দিতে নিষেধ করার মধ্যই পরোক্ষভাবে যদিও সঠিক ওজন করার আদেশ হয়ে গেছে, তথাপি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হযরত শোয়ায়েব (আঃ) উদাস্ত আহ্বান জানালেন  
 وَيٰٓقَوْمِ اَوْثُوْا لِلْبَيْتِ الْاَسْوَدِ الَّذِىۡ فِىۡ الْاَرْضِ  
 وَالْمِيْزَانَ يٰۤاٰقِطِيْنَ وَلَا تَبْخُسُوْا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَكْفُرُوْا بِالْاَرْضِ

مُّسِيْبِيْنَ ﴿١١١﴾  
 ‘হে আমার জাতি! ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাণ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কম দিও না আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।’ অতঃপর তিনি মমতার সাথে আরো বললেন :  
 يٰۤاٰقِطِيْنَ اللّٰهُ خَيْرٌ لِّكُمْ اَنْ تَبْخُسُوْا النَّاسَ وَمَا اَنْتُمْ بِبٰرِحِيْنَ ﴿١١٢﴾  
 ‘মানুষের পাওনা ঠিকমত ওজন করে পুরোপুরি দিয়ে দেয়ার পর যে লভ্যাংশে উদ্ধৃত থাকে, তোমাদের জন্য তা-ই উত্তম। পরিমাণে স্বল্প হলেও আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে বরকত দান করবেন, যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর। আর যদি অমান্য কর, তবে মনে রেখ-তোমাদের উপর কোন আযাব অবতীর্ণ হলে, তা থেকে তোমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমার নয়।’

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) সমুদ্রে রসুলে করীম (সঃ) মন্তব্য করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন ‘খতীবুল-আম্মিয়া’ বা নবীগণের মধ্যে প্রধান বক্তা। তিনি তাঁর সুললিত বয়ান ও অপূর্ব বাগ্মীতার মাধ্যমে স্বীয় জাতিকে বোঝানো এবং সংপথে ফিরিয়ে আনার সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু এত কিছু শোনার পরেও তাঁর কণ্ডমের লোকেরা পূর্ববর্তী বর্ষর পাশিষ্ঠদের ন্যায় একই জবাব দিল। তারা নবীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতঃ আল্লাহর নবীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রাণ করে বলল :

اٰصْلُوْكَ تَكْتُمُوْكَ اِنْ تَكْتُمُوْكَ اَنْ تَكْتُمُوْكَ اَنْ تَكْتُمُوْكَ اَنْ تَكْتُمُوْكَ  
 اِبٰؤُنَا وَاَنْ تَقْعَلُوْا فِىۡ اَمْوَالِنَا مَا نَشَآؤُا اِنَّكَ لَكُنْتَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ الرَّشِيْدِ

আপনার নামায কি আপনাকে শিক্ষায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দেই, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যার পূজা করে আসছে। আর আমাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করার

অধিকারী না থাকি? কোনটা হালাল কোনটা হারাম তা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে করে সব কাজ করতে হবে?

হযরত শোয়েব (আঃ) সম্পর্কে সারাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি অধিকাংশ সময় নামায ও নফল এবাদতে মগ্ন থাকেন। তাই তারা তাঁর মূল্যবান নীতি বাক্যসমূহকে বিক্রয় করে বলতে- আপনার নামায কি আপনাকে এসব আবোল-তাবোল কথাবার্তা শিক্ষা দিচ্ছে?

ওদের এসব মন্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, এরা ধর্মকে শুধু কতিপয় আচার-আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করতো। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মকে কোন দখল দিত না। তারা মনে করত, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধন-সম্পদ যেমন খুশী ভোগ দখল করতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা ধর্মের কাজ নয়। যেমন, বর্তমান যুগেও কোন কোন অবুঝ লোকের মধ্যে এহেন চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়।

অকৃত্রিম দরদ, নিঃস্বার্থ কল্যাণকামিতা ও সদুপদেশের জ্বাবে কণ্ঠের লোকেরা কতবড় ক্লাভ মন্তব্য করল। কিন্তু হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর চরিত্রে ছিল নবীসুলভ সহনশীলতা। তাই উপহাস-পরিহাসের পরেও তিনি দরদের সাথে তাদেরকে সম্মোহন করে বোঝাতে লাগলেন :

قَالَ يٰ قَوْمِ اِنَّكُمْ لِرَبِّكُمْ لَكُمْ عَلٰىٰٓ اٰیٰتٍ تَنْتَهُوْنَ رَبِّیْ وَرَزَقْنِیْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا

হে আমার জাতি! তোমরা বলতো, যদি আমার প্রভুর পক্ষ হতে আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য আমার কাছে থাকে এবং আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে সর্বাধিক উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, অর্থাৎ, দেহের

জন্য প্রয়োজনীয় বাহ্যিক রিযিকও দান করেছেন অধিকন্তু বুদ্ধি-বিলেহ তথা নবুওয়তের দুর্লভ মর্যাদাও দান করেছেন, এতদসত্ত্বেও কি আমি তোমাদের মত অন্যায ও গোমরাহীর পথ অবলম্বন করব এবং সত্যের কণী তোমাদেরকে পৌছাব না?

অতঃপর তিনি আরো বললেন -

وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ

তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি যে কাজ হতে তোমাদেরকে বাধা দেই, নিজেও তার কাছে কখনো যাই না। আমি যদি তোমাদেরকে নিষেধ করে নিজে সে কাজ করতাম তাহলে তোমাদের কথা বলার অবকাশ ছিল।

এতদ্বারা বোঝা গেল যে, ওয়াজ্ব নসিহত ও তকলীগকারীর কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা অপরিহার্য। অন্যথায় তার কথায় শোভাভঙ্গ কোন ফায়দা হয় না।

অতঃপর বলেন- اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِسْلَامَ مَا اسْتَطَعْتُ

“আমার আশ্রয় চেষ্টা এবং বার বার বোঝাবার একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাদেরকে যথাসাধ্য সংশোধন করা। অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আর চেষ্টা-সাধনাও নিজ বাহু বলে নয় বরং -

وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنۡجِبُ

“আমি যা কিছু করছি তা আল্লাহর মদদেই করছি। অন্যথায় আমার চেষ্টা করারও সাধ্য ছিল না। তাঁর উপরই আমি ভরসা রাখি এবং সর্বকাজে সর্বাবস্থায় তাঁরই প্রতি রুদ্ধ হই।”

## আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নসীহত ও উপদেশ দানের পরে তিনি পুনরায় তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে সতর্ক করে বললেন—

وَيَقَوْمٍ لَا يُحِيزُهُمْ شِقَاتِي أَنْ يُصِيبَهُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ لَوْمَئِيِّ

হে আমার কণ্ডম, সাবধান! আমার সাথে বিদ্বেষ ও জ্বিদ করে তোমরা নিজেদের উপর কণ্ডমে নূহ অথবা কণ্ডমে হুদ কিংবা সালেহ (আঃ)—এর কণ্ডমের মত বিপদ ডেকে আনবে না। আর লূত (আঃ)—এর জাতি ও তাদের শোচনীয় পরিপত্ন তো তোমাদের থেকে খুব দূরেও নয়। অর্থাৎ, কণ্ডমে লূতের উল্টিয়ে দেয়া জনপদগুলি মাদইয়ান শহরের অদূরেই অবস্থিত। তাদের উপর আযাব নামিল হওয়ার ঘটনা তোমাদের সময় থেকে খুব আগের কোন ব্যাপার নয়। অতএব, উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং হঠকারিতা পরিত্যাগ কর।

কণ্ডমের লোকেরা একথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল—  
“আপনার গোষ্ঠী-জাতির কারণে আমরা এতদিন আপনাকে কিছু বলিনি। নতুবা অনেক আগেই প্রস্তর আঘাতে আপনাকে হত্যা করে ফেলতাম।”

এরপরে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে নসীহত করে বললেন—  
“তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজনকে ভয় কর, সম্মান কর, অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর না।”

শেষ পর্যন্ত কণ্ডমের লোকেরা যখন হযরত শোয়ায়েব (আঃ)—এর কোন কথা মানল না, তখন তিনি বললেন—“ঠিক আছে, তোমরা এখন আযাবের অপেক্ষা করতে থাক।” অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুসারে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)—কে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী ঈমানদারগণকে উক্ত জনপদ হতে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন এবং হযরত জিব্রাইল (আঃ)—এর এক ভয়ঙ্কর হািকে অবশিষ্ট সবাই এক নিমেষে ধ্বংস হল।

## আহুকাম ও মাসায়েল

মাপে কম দেয়া : আলোচ্য আয়াতসমূহে মাদইয়ানবাসী ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ নির্দেশ করা হয়েছে মাপে কম দেয়াকে, আরবীতে যাকে ‘ততকীফ’ বলা হয়। কোরআন করীমের—  
وَيَلِّقُ لِلْمُطَّقَيْنِ  
‘আয়াতে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ওলামায়ে উস্মতের ‘এজমা’ বা সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহা সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম মালেক (রহঃ) তদীয় ‘মোয়াত্বা’ কিতাবে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)—এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, ওজন-পরিমাপে কম দেয়ার কথা বলে, আসলে বোঝান হয়েছে— কারো কোন ন্যায্য পাওনা পুরোপুরি না দিয়ে কম দেয়া; তা ওজন ও পরিমাপ করার বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু হোক। কোন বেতনভোগী কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে গড়িমসি করে, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কম সময় কাজ করে, কোন শিক্ষক যদি যত্ন সহকারে শিক্ষাদান না করে অথবা কোন নামাযী ব্যক্তি যদি নামাযের সুনতুলি পালনে অবহেলা করে তবে তারাও উক্ত তাতকীফের অপরাধীদের তালিকাত্ত্ব হবেন।—(নোউজুবিল্লাহি মিনহ)

وَيَقَوْمٍ لَا يُحِيزُهُمْ شِقَاتِي أَنْ يُصِيبَهُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ لَوْمَئِيِّ  
بِمَعْيَدِي ۚ وَاسْتَعْفِفْ وَأَرْزُقْهُمْ نُوْحُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝ قَالَ الْإِسْحَابُ مَا نُنْفِقُ كَيْدًا إِنَّمَا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكُ فِيهَا ضَالِّينَ ۚ لَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَآتَيْنَاكَ آيَاتِنَا بِعَزَائِرٍ ۝ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ آيَاتِي أَنْ لَا تُعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ أَتَدْعُونَ شُوعُبَةَ وَآدَامَ طَهْرِيًّا إِنِّي رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا لِعَلِّكُمْ مَكْرَهُ لِي إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَارِيٌّ ۚ وَانصَبُوا إِلَىٰ مَنْعَكُمْ رِقْدِكُمْ ۚ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شَعْبِيًّا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْئَةَ فَاصْبِرُوا إِنِّي ذِي بَرْهَةٍ ۚ كَانَتْكُمْ عُقُوبَةُ الْآثِمِينَ ۚ بَعْدَ الْإِذْنِ ۚ كَمَا بَيَدَاتْ مُبْرَدٌ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۝

(১৬) আর হে আমার জাতি! আমার সাথে জ্বিদ করে তোমরা নূহ বা হুদ অথবা সালেহ (আঃ)—এর কণ্ডমের মত নিজেদের উপর আযাব ডেকে আনবে না। আর লূতের জাতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়। (১৭) আর তোমাদের পালনকর্তার কাছে মাজনা চাও এবং তাঁরই পানে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগার খুবই মেহেরবান অভিস্নেহময়। (১৮) তারা বলল— হে শোয়ায়েব (আঃ), আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি নাই, আমরা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তিরূপে মনে করি। আপনার ভাই-বন্ধুরা না থাকলে আমরা আপনাকে ধস্তারাঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি নন। (১৯) শোয়ায়েব (আঃ) বলল— হে আমার জাতি, আমার ভাই-বন্ধুরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে প্রভাবশালী? আর তোমরা তাকে বিশৃঙ্খল হয়ে পেছনে ফেলে রেখেছ, নিশ্চয় তোমাদের কার্যকলাপ আমার পালনকর্তার আয়ত্তে রয়েছে। (২০) আর হে আমার জাতি, তোমরা নিজ স্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি, অচিরেই জানতে পারবে কার উপর অপমানকার আযাব আসে আর কে মিথ্যাবাদী? আর তোমরাও অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। (২১) আর আমার হুকুম যখন এল, আমি শোয়ায়েব (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে রক্ষা করি আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন পতিত হলো। ফলে তোর না হতেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (২২) যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করে নাই। জেনে রাখ, সামুদের প্রতি অভিসম্পাতের মত মাদইয়ানবাসীর উপরেও অভিসম্পাত। (২৩) আর আমি মুসা (আঃ)—কে ধ্বংস করি আমার নির্দশাদি ও সুস্পষ্ট সনদসহ (২৪) ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে; তবুও তারা ফেরাউনের হুকুমে চলতে থাকে, অথচ ফেরাউনের কোন কথা ন্যায়-সঙ্গত ছিলনা।

هود ۱۱

۲۳۲

وَمِنْ آيَاتِهِ ۱۳

يَقْدِرُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْدَدَهُمُ الْقَارُونَ وَيَسُورُ  
 الْمُرُودَ ۝ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنَسِّسُ  
 الرِّفْدَ الْمَرْفُودَ ۝ ذَلِكَ مِنَ آيَاتِ الْقُرْآنِ نَقَّضَهُ عَلَيْكَ وَمِمَّا  
 قَالَهُمْ وَحَقِيقًا ۝ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَلَّمُوا نَفْسَهُمْ فَمَا  
 أَعْنَتُ عَنْهُمْ الْهُمُومُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ  
 شَيْءٍ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ مَرْزُوقٌ وَمَا زَادُهُمْ عِزًّا سُبْحَانَ اللَّهِ  
 أَخَذَ رَيْكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِمَنْ أَخَذَ ۝ أَلَمْ  
 تَرَ شَدِيدًا ۝ إِنِّي فِي ذَلِكَ لِآيَةٍ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۝  
 ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعُهُ لِقَاءُ النَّاسِ لِذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ۝ وَمَا  
 نُورُجْرَةَ إِلَّا لِأَجْلِ مَعْدُودٍ ۝ يَوْمَ يَأْتِي لِرُكْنِكَ نَفْسٌ إِلَّا  
 بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ سُعْيٌ وَسُؤِيدٌ ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ شَعَرُوا فِي  
 النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهْقٌ ۝ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ  
 السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ تَقَالٌ لِمَا  
 يُرِيدُ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ سُودُوا فِي الْجَنَّةِ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ  
 السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ خَيْرٌ مِمَّا يُرِيدُونَ ۝

(১৮) কেয়ামতের দিন সে তার জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগনে পৌঁছে দিবে, আর সেটা অতীব নিকট স্থান, যেখানে তারা পৌঁছেছে। (১৯) আর এ জগতেও তাদের শেহনে লানত রয়েছে এবং কেয়ামতের দিনেও; অত্যন্ত জঘন্য প্রতিফল, যা তারা পেয়েছে। (২০) এ হচ্ছে কয়েকটি জনপদের সামান্য ইতিবৃত্ত, যা আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। তন্মধ্যে কোন কোনটি এখনও বর্তমান আছে আর কোন কোনটির শিকড় কেটে দেয়া হয়েছে। (২০) আমি কিন্তু তাদের প্রতি জুলুম করি নাই বরং তারা নিজেরাই নিজের উপর অবিচার করেছে। ফলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব মানুষকে ডাকতো আপনার পালনকর্তার হুকুম যখন এসে পড়ল, তখন কেউ কোন কাজে আসল না। তারা শুধু বিপর্যয়ই বৃদ্ধি করল। (২০২) আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই যারাজক, বড়ই করোঁদ। (২০৩) নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন প্রতিটি মানুষের জন্য যে আখেরাতের আযাবকে ভয় করে। উহা এমন একদিন, যেদিন সব মানুষই সমবেত হবে, সেদিনটি যে হাযিরের দিন। (২০৪) আর আমি যে উহা নিলিখিত করি, তা শুধু একটি ওয়াদার কারণে যা নিখারিত রয়েছে। (২০৫) যেদিন তা আসবে সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। অতঃপর কিছু লোক হবে হতভাগ্য, আর কিছু লোক সৌভাগ্যবান। (২০৬) অতএব যারা হতভাগ্য তারা দেখাশে যাবে, সেখানে তারা আত্মদান ও চিংকার করতে থাকবে। (২০৭) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদেগার যা ইচ্ছা করতে পারেন। (২০৮) আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতের মাঝে, সেখানেই চিরদিন থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ভিন্ন হওয়ার নয়।

মাসআলা : তফসীরে কুরআনে আছে যে, মাদইয়ানবাসীর আরেকটি দুর্কর্ম ছিল যে, তারা প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার পাশ্চ হতে স্বর্ণ-রৌপ্য কেটে রেখে সেগুলো বাজারে চালিয়ে দিত। হযরত শোহাবে (আঃ) তাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করেছিলেন।

হাদীস শরীফে আছে যে, রসুলে করীম (সাঃ) মুসলিম রাষ্ট্রের মুদ্রা জন্ম করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কোরআন পাকের ১৯ পারা, সূরাহ নফল ৪৮ নং আয়াত رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْعَامِكَ ذَرْبًا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا كِبْرًا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইয়ামুল মোফাসেেরীন হযরত জায়েদ ইবনে আসলাম বলেন—মাদইয়ানবাসীরা দীনার ও দিরহাম কেটে তা থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য আত্মসাৎ করতো। যাকে কোরআন করীমের ভাষায় মারাত্মক দুষ্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিযের (রহঃ) খেলাফত কালে এক ব্যক্তিকে দিরহাম কর্তনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। খলিফা তাকে দোরী মারা ও মস্তক মুন্ডন করে শহরে প্রদক্ষিণ করাবার নির্দেশ দিলেন।—(তফসীরেকুরআনী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হুদে হযরত নূহ (আঃ) থেকে হযরত মুসা (আঃ) পর্যন্ত বিশিষ্ট নবীগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের ঘটনাবলী এক বিশেষ বর্ণনামূলক মাধ্যমে বিবৃত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বহু উপদেশ, হেকমত, আহকাম ও হেদায়েত বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উক্ত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য রসুলে করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে সমগ্র উম্মতে-মুহাম্মাদীকে আহ্বান জানান হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—

ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ نَقَّضَهُ عَلَيْكَ وَمِمَّا قَالَهُمْ وَحَقِيقًا

অর্থাৎ, এটা পূর্ববর্তী মুগে কতিপয় শহর ও জনপদের কাহিনী, আমি আপনার সামনে তুলে ধরছি, যার উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয়েছে। তন্মধ্যে কোন কোন শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। আর কোন কোন জনপদকে এমনভাবে নিষ্কিহ করা হয়েছে, যেমন ক্ষেতের ফসল কর্তন করে তাকে সমান করার পর পূর্ববর্তী ফসলের কোন চিহ্ন থাকে না।

অতঃপর বলেন যে, আমি তাদের উপর কোন জুলুম করি নাই, বরং তারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে। কেননা, তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা প্রভূকে পরিত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া, হাতে তৈরী মূর্তিকে বা অন্য কিছুকে মা'বুদ সাব্যস্ত করেছে। যার ফলে আল্লাহর আযাব যখন নেমে এল, তখন ঐসব কাশ্মনিক মা'বুদরা তাদের কোন সাহায্য করতে পারল না। আর আল্লাহ তাআলা যখন কোন জনপদবাসীকে আযাবের সাথে পাকড়াও করেন, তখন অত্যন্ত শক্ত ও নির্মমভাবে পাকাড়ও করেন। তখন আত্মরক্ষার জন্য কারো কোন গত্যন্তর থাকে না।

অতঃপর সবাইকে আখেরাতের চিন্তায় মগ্ন করার জন্য এরশাদ করেন যে, এসব ঘটনাবলীর মধ্যে ঐসব লোকের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনাবলী রয়েছে, যারা পরকালের আযাবকে ভয় করে। যেদিন সমস্ত মানবজাতি একই ময়দানে সমবেত হবে, সেদিনটি এতই ভয়াবহ যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারবেন না।



## আনুষ্ঠানিক স্ফাভাব্য বিষয় :

অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে পুনরায় এরশাদ করেছেন—

فَأَسْتَوَىٰ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থাৎ, আপনি দ্বীনের পথে দৃঢ়ভাবে সোজা চলতে থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর যারা কুফরী হতে তওবা করে আপনার সাধী হয়েছে, তারাও সোজা পথে চলুক এবং আল্লাহ্ তাআলার নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে না। কেননা, তিনি তোমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন।

ইস্তেকামতের তাৎপর্য, উপকারিতা ও মাসায়েল : 'ইস্তেকামতের' আসল অর্থ হচ্ছে, কোনদিক একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা। বস্তুর এ কোন সহজ কাজ নয়। কোন লৌহদণ্ড বা পাথরের থাম একজন সুদক্ষ প্রকৌশলী হয়ত এমনভাবে দাঁড় করাতে পারে, কিন্তু কোন প্রাণীর পক্ষে সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকা কত দুষ্কর তা কোন সাধারণ বোধসম্পন্ন ব্যক্তির অজানা নয়।

হয়রত রসূলে করীম (সাঃ) ও সকল মুসলমানকে তাদের সর্বকার্যে সর্বাবস্থায় ইস্তেকামত অবলম্বন করার জন্য অত্র আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

'ইস্তেকামত' শব্দটি ছোট হলেও এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা, সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে— আকায়েদ, এবাদত, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ উপার্জন ও ব্যয় তথা নীতি-নৈতিকতার যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে তাঁরই নির্দেশিত সোজা পথে চলা। তন্মধ্যে কোন ক্ষেত্রে, কোন কার্যে এবং পরিস্থিতিতে গড়িমসি করা, বাড়াবাড়ি করা অথবা ডানে বামে ঝুঁকে পড়া ইস্তেকামতের পরিপন্থী।

দুনিয়ার যত গোমরাহী ও পাপাচার দেখা যায়, তা সবই ইস্তেকামত হতে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। আকায়েদ অর্থাৎ, ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইস্তেকামত না থাকলে, মানুষ বেদ'আত হতে শুরু করে কুফরী ও শেরেকী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তাআলার তওহীদ, তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে হয়রত রসূলে করীম (সাঃ) যে সুস্পষ্ট ও সঠিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন পরিবর্তনকারী পথভ্রষ্টরূপে আধ্যাতিক হলে, তা তার নিয়ত যতই ভাল হোক না কেন। অনুরূপভাবে নবী ও রসূল (আঃ)-গণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ত্রুটি করা স্পষ্ট ধৃষ্টতা ও পথভ্রষ্টতা।

তোমনি কোন রসূলে খোদায়ী গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক বানিয়ে দেয়াও চরম পথভ্রষ্টতা। ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা এহেন বাড়াবাড়ির কারণেই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে। এবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করার জন্য কোরআনে আযীম ও রসূলে করীম (সাঃ) যে পথনির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে কোনরূপ কমতি বা গাফলতি মানুষকে যেমন ইস্তেকামতের আদর্শ হতে বিচ্যুত করে, অনুরূপভাবে তার মধ্যে নিজের পক্ষ হতে কোন বাড়াবাড়ি বা পরিবর্তনও মানুষকে বেদ'আতে লিপ্ত করে। সে কম্পনাবিলাসে বিভোর থাকে যে, আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিল করছি, অথচ সে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্ তাআলার বিরাগভাজন হতে থাকে। এজন্যই হয়রত রসূলে আকরাম (সাঃ) স্বীয় উম্মতকে বেদ'আত ও নিত্য নতুন

فَلَا تَكُ فِي مَرْبِئَةٍ مِّمَّا يَعْجُدُ هَؤُلَاءُ مَا يَعْجُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْجُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَفَرُوا مَنقُوصٌ ۗ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَاُولَٰئِكَ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لِقَاؤُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۗ وَأَنَّ كَلِمَاتٍ كُنَّا نُرِيدُ أَنْ يَمْلِكُنَّ بِهَا لَمَبِئُونَ حَيْثُ ۗ فَاسْتَوَىٰ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّوْا نَارَهُمْ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُرُومِ وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ إِنَّ السَّاعَاتِ يُدْهِبُهَا فِي الْوَجْهِ الْهَارِ وَمَنْ لَكُمْ مِنَ الْكُوفِينَ ۗ وَأَصِيرٌ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَصْبِرُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَسْهُونَ عَنْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ آمَنَّا مِنْهُمْ وَأَتَّبَعَهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا بِقُرْبَانٍ وَكَانُوا كَافِرِينَ ۗ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِدِكَ الْقُرَىٰ يُظَلِّمُهُمْ وَأَهْلُهَا مُصَلِّونَ ۗ

(১০৯) অতএব, তারা যেসবের উপাসনা করে তুমি সে ব্যাপারে কোনরূপ ঠোঁকায় পড়বে না। তাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারা যেমন পূজা উপাসনা করত, এরাও তেমন করছে। আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে আযাবের ভাগ কিছু মাত্র কম না করেই পুরোপুরি দান করবো। (১১০) আর আমি মুসা (আঃ)-কে অবশ্যই কিতাব দিয়েছিলাম অতঃপর তাতে বিরোধ সৃষ্টি হল; কনাবাহ্ব্য তোমার পালনকর্তার পক্ষ হতে, একটি কথা যদি আয়েই বলা না হত, তাহলে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত। তারা এ ব্যাপারে এমনই সন্দেহবোধ যে, কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছে না। (১১১) আর যত লোকই ঠোঁক না কেন, যখন সময় হবে, তোমার প্রভু তাদের সকলেরই আমলের প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন। নিশ্চয় তিনি তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের স্বর রাখেন। (১১২) অতএব, তুমি এবং তোমার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলে যাও— যেমন তোমায় হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সীমা লঙ্ঘন করবে না, তোমারা যা কিছু করছ, নিশ্চয় তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। (১১৩) আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুন ধরবে। আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না। (১১৪) আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতেরও প্রান্তভাগে, পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক। (১১৫) আর ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শূণ্যবানদের প্রতিদান নিশ্চয় করেন না। (১১৬) কাজেই, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলির মধ্যে এমন সংকমশীল কেন রইল না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; তবে মুঠিময় লোক ছিল যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছি। আর পাপিষ্ঠরা তো ভোগবিলাসে মগ্ন ছিল—যার সামগ্রী তাদেরকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছিল। আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী। (১১৭) আর তোমার পালনকর্তা এমন নয় যে জনবসতিগুলোকে অন্যায়াভাবে ধ্বংস করে দেবেন, সেখানকার লোকেরা সংকমশীল হওয়া সত্ত্বেও।

সৃষ্টি প্রথা হতে অত্যন্ত জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন এবং বেদ' আতকে চরম গোমরাহী বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, যখন কোন কার্য সে আল্লাহ্ ও রসূল (সাঃ)—এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবাদত হিসাবে করতে চায়, তখন কাজ করার আগে পূর্ণ তাহকীক করে জানতে হবে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উক্ত কার্য ঐভাবে করেছেন কি না? যদি না করে থাকেন, তবে উক্ত কাজে নিজের শক্তি ও সময়ের অপচয় করবে না।

অনুরূপভাবে আদান-প্রদান, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন করীমে নির্দেশিত মূলনীতিগুলিকে রসূলে করীম (সাঃ) বাস্তবে রূপায়িত করে একটা সুস্থ সঠিক মধ্যপন্থার পন্থন করেছেন। যার মধ্যে বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ক্রোধ, ঘেঁষা, মিতব্যয় ও দানশীলতা, জীবিকা উপার্জন, বৈরাগ্য সাধনা, আল্লাহর উপর নির্ভরতা, সম্ভাব্য চেষ্টা-তদ্বির করা, আবশ্যকীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এক নজীরবিহীন মধ্যপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। তা পুরোপুরি অবলম্বন করেই মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারে। তা থেকে বিচ্যুত হলেই সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সারকথা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঈমানের অনুশাসন মেনে চলাই ইস্তেকামতের তফসীর।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমীপে আরজ করলেন, "হীয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)। ইসলাম সম্পর্কে আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষা দান করুন যেন আপনার পরে আমার কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়।" তিনি বললেন—*قل أمنت بالله ثم استقم* অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি ঈমান আন, অতঃপর ইস্তেকামত অবলম্বন কর।—(মুসলিম শরীফ ও তফসীরে কুরতুবী)

ওসমান ইবনে হাযের আযদী বলেন— একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম যে, "আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন। তদুত্তরে তিনি বললেন *عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتع* খোদাভীতি ও ইস্তেকামত অবলম্বন কর, যার পন্থা হচ্ছে ধর্মীয় ব্যাপারে শরিয়তের অনুশাসন স্বহস্ত মেনে চল, নিজের পক্ষ হতে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে যেনো না।—(দারেমী ও কুরতুবী)

এ দুনিয়ায় ইস্তেকামতই সবচেয়ে দুষ্কর কার্য। এজন্যই বুয়ুর্গানেদ্বীন বলেন যে, কারামতের চেয়ে ইস্তেকামতের মর্যাদা উর্ধ্ব। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সর্বকার্যে ইস্তেকামত অবলম্বন করে, যদি জীবনভর তাঁর দ্বারা কোন অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত না হয়, তথাপি ওলাীগণের মধ্যে তাঁর মর্যাদা সবার উর্ধ্ব।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন— "পূর্ণ কোরআন পাকের মধ্যে অত্র আয়াতের চেয়ে কঠিন ও কষ্টকর কোন হুকুম রসূলে আকরাম (সাঃ)—এর উপর নাযিল হয় নাই।" তিনি আরো বলেন— একবার সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর দাড়ি যোবারকের কয়েক গাছি পেকে গেছে দেখতে পেলেন, তখন আফসোস করে বললেন, আপনার দিকে দ্রুত গতিতে বার্বক্য এগিয়ে আসছে। তদুত্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন— "সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে।" সূরা হুদ বর্ণিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির উপর কঠোর আযাবের ঘটনাবলীও এর কারণ হতে

পারে। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন— "ইস্তেকামতের" নির্দেশ ছিল বার্বক্যের কারণ।

তফসীরে কুরতুবীতে হযরত আবু আলী সিরী হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি স্বপ্নে রসূলে করীম (সাঃ)—এর জেয়ারত লাভ করে জিজ্ঞেস করলেন— "হীয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ), আপনি কি একথা বলেছেন যে, 'সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে?' তিনি বললেন "হী"। পুনরায় প্রশ্ন করলেন— উক্ত সূরায় বর্ণিত নবী (আঃ)—গণের কাহিনী ও তাঁদের কণ্ঠসমূহের উপর আযাবের ঘটনাবলী কি আপনাকে বৃদ্ধ করেছে? তিনি জবাব দিলেন— "না"। বরং *فَأَسْتَوُوا كَمَا أُرْتُوا* "ইস্তেকামত অবলম্বন কর যেমন তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" এ আয়াতই আমাকে বৃদ্ধ করেছে।

একথা স্পষ্ট যে, রসূলে করীম (সাঃ) পরিপূর্ণ মানুষের বাস্তব নমুনাক্রমে এ জগতে সুভাগমন করেছিলেন। ইস্তেকামতের উপর সুদৃঢ় থাকা ছিল তাঁর জগমত স্বভাব। তথাপি অত্র নির্দেশকে এতদূর গুরুত্ব মনে করার কারণ এই যে, অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে শুধু সোজা পথে দৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং *فَأَسْتَوُوا* "যেভাবে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে" বলে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা হয়েছে। নবী ও রসূল (আঃ)—গণের অন্তরে অপরিসীম খোদাভীতি প্রবল প্রভাবের কথা কারো অজানা নয়। তাই পূর্ণ ইস্তেকামতের উপর কায়ম থাকা সত্ত্বেও রসূলে পাক (সাঃ) সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা যেরূপ ইস্তেকামতের নির্দেশ দিয়েছেন, তা পুরোপুরি আদায় করা হচ্ছে কি না?

আরেকটি কারণ হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের ইস্তেকামতের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। কেননা, আল্লাহর ক্ষমতা তা পূর্ণ মাত্রায় হাসিল ছিল। কিন্তু উক্ত আয়াতে সমগ্র উম্মতকে সোজা পথে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ উম্মতের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) অতীব চিন্তিত ও শঙ্কিত ছিলেন।

ইস্তেকামতের আদেশ দানের পর বলেন *وَلَا تَطْمَئِنُّوا* "সীমালঙ্ঘন করে না। এটা *طغيان* শব্দ হতে গৃহীত। যার অর্থ সীমা অতিক্রম করা। এখানে সোজা পথে দৃঢ় থাকার আদেশ দান করেই শুধু ক্ষান্ত করা হয় নাই। বরং তার নেতিবাচক দিকটিও স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, আকায়েদ, এবাদত, লেন-দেন ও নীতি-নেতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল (সাঃ)—এর নির্ধারিত সীমারোখা অতিক্রম করো না। কেননা, এটাই পার্থিব ও ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় ও ফাসাদের মূল কারণ।

১১৩ নং আয়াতে মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস হতে থেকে রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে — *وَلَا تَرْكَبُوا أَسْوَاطَ الْاَنْعَامِ الَّتِي كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ* অর্থাৎ, "ত্রিসব পাষাণদের দিকে একটুও ঝুঁকবে না,

তাহলে কিন্তু তাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে।" "লা-তারকানু" শব্দের মূল হচ্ছে *ركون* যার অর্থ "কোন দিকে সামান্যতম ঝোঁকা বা আকৃষ্ট হওয়া এবং তার প্রতি আস্থা বা সম্মতি জ্ঞাপন করা।" সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, পাশ-পাশ্চলিত্য লিপ্ত হওয়াকে তো সবাই ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর বলে বিপণ্য করেই; অধিকন্তু পাষাণদের প্রতি সামান্যতম ঝুঁকি পড়া, আকৃষ্ট হওয়া, আস্থা বা মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করাও সমান ক্ষতিকর।

এই বোকা ও আকর্ষণের অর্থ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেয়াম ও আব্বীপাশের কয়েকটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই। বরং প্রত্যেকটি উক্তিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও সঠিক।

“পাপিষ্ঠদের প্রতি মোটেই ঝুঁকবে না” এ কথা র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত কাতাডা (রাঃ) বলেন— “পাপিষ্ঠদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, তাদের কথামত চলবে না।” হযরত ইবনে জোরাইজ বলেন— “পাপিষ্ঠদের প্রতি মোটে আকৃষ্ট হবে না। হযরত আবুল আলিয়া (রাঃ) বলেন— “তাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তা উচ্ছন্ন করো না।”—(কুরতুবী) ‘সূদী’ (রাঃ) বলেন— “তাদের অন্যায় কার্যে সম্মতি প্রকাশ বা নীরবতা অবলম্বন করবে না।” ইকরিমা (রাঃ) বলেন— তাদের সংসর্গে থাকবে না। কাযী ‘বায়জাবী’ (রাঃ) বলেন— “বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে, লেবাস-পোশাকে, চাল-চলনে তাদের অনুকরণও অত্র নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।”

কাযী বায়জাবী (রাঃ) আরো বলেন— পাপাচার অন্যায়ের নিষিদ্ধ ও হুজুম ঘোষণা করার জন্য এখানে এমন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যার চেয়ে অধিকতর জোরালো ভাষা কল্পনা করা যায় না। কেননা, পাপিষ্ঠদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্কেই শুধু নিষেধ করা হয়নি বরং তাদের প্রতি সামান্যতম আকৃষ্ট হওয়া, তাদের কাছে উপবেশন করা, তাদের কার্যকলাপের প্রতি মৌনতা অবলম্বনও নিষেধ করা হয়েছে।

ইমাম আওয়ামী (রাঃ) বলেন— সমগ্র জগতে ঐ আলেমই আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়—যে নিজের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়।—(তফসীরে মাযহাবী)

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায়— ক্রোধের মুশরিক, বেদআতী ও পাপিষ্ঠদের সংসর্গ হতে দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য। বস্তৃতঃ মানুষের ভাল-মন্দ হওয়ার মধ্যে সংসর্গ ও পরিবেশের প্রভাবই সর্বাধিক। তবে একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজনবশতঃ অনন্যোপায় হয়ে তাদের কাছে যাওয়া জায়েয।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের দু’টি শব্দ সম্পর্কে বলেন— আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ দীনকে দু’টি হরফের মাঝে জমা করে দিয়েছেন। এক **وَأَقْرَبُوا** সীমালঙ্ঘন করবে না, দ্বিতীয়— **وَأَقْرَبُوا** পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। প্রথম আয়াতে শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে খারাপ লোকদের সংস্পর্শে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এটাই সমস্ত দীনদারীর সার সংক্ষেপ।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রসুল পাক (সাঃ)—এর মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিতঃ সূরা হুদে পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর নবীয়ে-করীম (সাঃ) ও উম্মতে মুহাম্মদীকে কতিপয় হেদায়েত দেয়া হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত **فَأَسْتَوُوا كَمَا أَمَرْتُ** আয়াত হতে যার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে।

কোরআন পাকের অস্পৃহ বাচনভঙ্গি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। এখানে যেসব আদেশ প্রদান করা হয়েছে, তাতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে সরাসরি সম্মোদন করা হয়েছে এবং উম্মতকে পরোক্ষভাবে উক্ত হুকুমের আওতায় আনা হয়েছে। যেমন— **فَأَسْتَوُوا كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ**

“আপনি সোজা পথে দৃঢ় থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং যারা তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে তারাও সোজাপথে চলতে থাকবে।” (১১২ নং আয়াত) ১১৪ নং আয়াতে **وَأَقْرَبُوا** “আপনি নামায কয়েম রাখুন।” ১১৫ তম আয়াতে **وَأَقْرَبُوا** ‘আপনি ধৈর্যধারণ করুন’ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যেসব কাজে নিষেধ করা হয়েছে এবং তা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে সরাসরি উম্মতকে সম্মোদন করা হয়েছে। যেমন ১১২তম আয়াতে **وَأَقْرَبُوا** “আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে না” ১১৩ নং আয়াতে **وَأَقْرَبُوا** “এবং তোমরা পাপীদের প্রতি ঝুঁকবে না” বলা হয়েছে।

অনুসন্ধান করলে সমগ্র কোরআন মজীদে সাধারণতঃ একই বাচনভঙ্গি পরিলক্ষিত হবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদেশ করা হয়েছে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে উদ্দেশ্য করে এবং নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে উম্মতের প্রতি সম্মোদন করে। যার মাধ্যমে রসুলে করীম (সাঃ)—এর মাহাত্ম্য ও উচ্চমর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে যে, নিন্দনীয় যত কাজ আছে, রসুলে পাক (সাঃ) নিজেই তা বর্জন করে থাকেন। আল্লাহ তাআলাই তাঁকে এমন স্বভাব-প্রকৃতি দান করেছেন যে, কোন নিন্দনীয় প্রকৃতি বা পাপকার্যের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ হয় না। এমনকি ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেসব জিনিস জায়েয ও হালাল ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়া আল্লাহ তাআলার জানা ছিল; রসুলে পাক (সাঃ) জীবনে কখনো সেগুলোর কাছেও যান নি। যেমন মদ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি।

১১৪তম আয়াতে রসুলে করীম (সাঃ)—কে লক্ষ্য করে তাঁকে ও তাঁর সমস্ত উম্মতকে নামায কয়েম রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ওলামায়ে-তফসীর, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ একমত যে, আলোচ্য আয়াতে সালাত অর্থ ফরয নামায, (বাহরে মুহীত ও তফসীরে কুরতুবী) এবং একামতে সালাত অর্থ পূর্ণ পাবন্দীর সাথে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করা। কোন কোন আলেমের মতে নামায কয়েম করার অর্থ সমুদয় সুনুত ও মুস্তাহাবসহ নামায আদায় করা। কারো মতে এর অর্থ মুস্তাহাব ওয়াস্তে নামায পড়া **وَأَقْرَبُوا** এর তফসীর প্রসঙ্গে উপরোক্ত তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। মূলতঃ এটা কোন মতানৈক্য নয়। বস্তৃতঃ আলোচ্য সবগুলোই একামতে সালাতের সঠিক মর্যাদা।

নামায কয়েম করার নির্দেশ দানের পর সংকীর্ণভাবে নামাযের ওয়াস্ত বর্ণনা করেছেন যে, “দিনের দু’প্রান্তে অর্থাৎ, শুরুতে ও শেষভাগে এবং রাতেরও কিছু অংশে নামায কয়েম করবে।” দিনের দু’প্রান্তের নামাযের মধ্যে প্রথমভাগের নামায সম্পর্কে সবাই একমত যে, সেটি ফজরের নামায। কিন্তু শেষ প্রান্তের নামায সম্পর্কে কেউ বলেন—তা মাগরিবের নামায। কেননা, দিন সম্পূর্ণ শেষ হওয়া মাত্র মাগরিবের নামায পড়া হয়। কেউ কেউ আসরের নামাযকেই দিনের শেষ নামায সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এটিই দিনের সর্বশেষ নামায। মাগরিবের ওয়াস্ত দিনের অংশ নয়, বরং দিন সমাপ্ত হওয়ার পর রাতের প্রথম প্রান্তে মাগরিবের নামায পড়া হয়। **وَرَكْعَاتًا** শব্দ বহুবচন, তার একবচন **رَكْعَةً** যার অর্থ হচ্ছে অংশ বা টুকরা। **وَرَكْعَاتَيْنِ** অর্থাৎ, রাতের কিছু অংশের নামায সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা’ব, কাতাডা, যাহ্যাক প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরকারের অভিমত হচ্ছে যে, সেটি মাগরিব ও এশার নামায। হাদীসেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে এরশাদ হয়েছে



কায় রেখে চলেন। পাপিষ্ঠ জালেমদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব বা অহেতুক সম্পর্ক রাখেন না, নামাযকে সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে আদায় করেন এবং শরীয়তের যাবতীয় অনুশাসন দৃঢ়তার সাথে মেনে চলেন।

মোটকথা, মুহাসিনীদের দলভুক্ত হতে হলে এমনভাবে সংকার্য করতে হবে যা স্বয়ং রসুল্লাহ্ (সাঃ) 'ইহসান' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য ও এবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ অথবা অন্ততঃ এতটুকু ধারণা করবে যে, আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সন্ত ও মহান গুণাবলী সম্পর্কে যখন কোন ব্যক্তির এ পর্যায়ের প্রত্যয় হৃদয় হলে, তখনকার যাবতীয় কার্যকলাপই সুষ্ঠু ও সুন্দর হওয়া জব্দান্তারী। পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যে তিনটি বাক্য বিশেষ প্রকৃতি ছিল, যা তাঁরা প্রায়শই একে অপরকে লিখে পাঠাতেন। বাক্য তিনটি সুরণ রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহের কাছে শগ্ন হয়, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তার পার্শ্বি কাজগুলি কন্যাসলবু এবং সুসম্পন্ন করে দেন। দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে—যে ব্যক্তি তার জন্তরকে ঠিক রাখবে অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুকেই অন্তর হতে বের করে দিয়ে অন্তরকে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তার বাহ্যিক অবস্থা ভাল করে দেবেন। তৃতীয় বাক্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক ঠিক রাখবে, তার সাথে অন্যান্য সকলের সম্পর্ক আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং ঠিক করে দেবেন।

(রুহুল বায়ান, ২য় জিলাদ ১৩১ পৃঃ)

১১৬ ও ১১৭তম আয়াতে পূর্ববর্তী জাতিগুলির উপর আযাব নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করে তা থেকে আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ করা হয়েছে। এরশাদ করেছেন : 'আফসোস, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে দাবিদ্বন্দী বিবেকবান কিছু লোক কেন ছিল না, যারা জাতিকে ফাসাদ সৃষ্টি করা হতে বিরত রাখত ? তাহলে তো তারা সমূলে ধ্বংস হত না। তবে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছিল, যারা নবী (আঃ)-গণের যথার্থভাবে অনুসরণ করেছে এবং তারাই আযাব হতে নিরাপদ ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা পার্শ্বি ভোগবিলাসে মগ্ন হয়ে অপকর্মে যেতে উঠেছিল।

অত্র আয়াতে সমঝদার বিবেকসম্পন্ন লোকদেরকে اُولُوْاٰلِیْمِیْنٍ বলা

হয়েছে। اُولُوْاٰلِیْمِیْنٍ অবশিষ্ট বস্তুকে বলে। মানুষ তার সবচেয়ে শ্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তুকে নিজের জন্য সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করতে অভ্যস্ত। প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্য সব জিনিস হাতছাড়া করেও সেটি ধরে রাখার চেষ্টা করে। এ জন্যই বিবেক-বিবেচনা ও দূরদর্শিতাকে اُولُوْاٰلِیْمِیْنٍ বলা হয়। কেননা, এটি সর্বাধিক শ্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ।

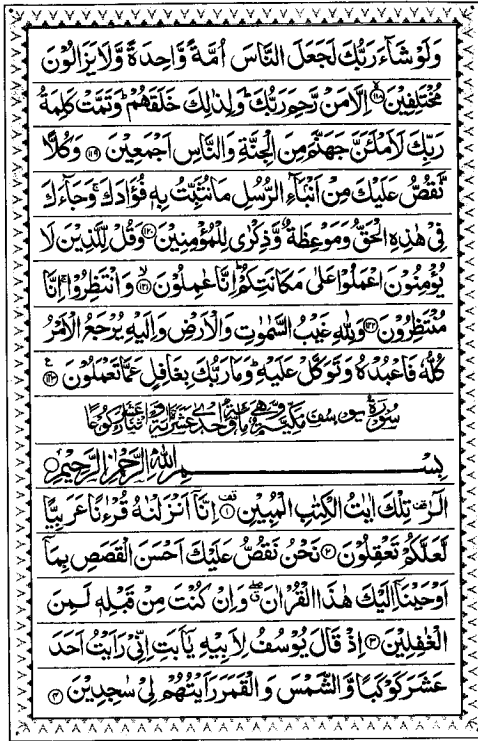
১১৭তম আয়াতে এরশাদ করেছেন যে, "আপনার পালনকর্তা জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে নিপাত করেন নাই এমতাবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা সংকমশীল ও আত্ম-সংশোধনরত ছিল।" এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে অন্যায় অবিচারের কোন সম্ভাবনা নাই। যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়, তারা প্রকৃতপক্ষেই নিপাতযোগ্য, অপরাধী।

কোন কোন তফসীরকারের মতে অত্র আয়াতে ظلم জুলুম অর্থ শেরেকী এবং مَصْرُوفٌ অর্থ ঐসব লোক যারা কাফের-মুশরেক হওয়া সত্ত্বেও তাদের লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, নীতি-নৈতিকতা ভাল। যারা মিথ্যা কথা বলে না, শোকাবাজী করে না, কারো কোন ক্ষতি করে না। সেমতে অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে, শুধু কাফের বা মুশরেক হওয়ায় দুনিয়ায় কোন জাতির উপর খোদায়ী আযাব অবতীর্ণ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের কার্য-কলাপ ও চাল-চলন দ্বারা পৃথিবীতে ফেৎনা-ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি না করে। পূর্ববর্তী যতগুলি জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের বিশেষ বিশেষ অপকর্মই তজ্জন্য দায়ী। হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি তাঁকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট-ক্লেশ দিয়েছিল, হযরত শোয়াইব (আঃ)-এর দেশবাসী ওজনে-পরিমাপে হের-ফের করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, হযরত লূত (আঃ)-এর কণ্ডম জঘন্য যৌন অপকর্মে অভ্যস্ত হয়েছিল, হযরত মুসা ও হারুন (সাঃ)-এর কণ্ডমের লোকেরা নিজেদের নবীগণের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেছিল। তাদের এ সব কার্য-কলাপই দুনিয়ায় তাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার মূল কারণ। শুধু কুফরী বা শেরেকীর কারণে দুনিয়ায় আযাব আপতিত হয় না। কেননা, তার শাস্তিতে তো দোষের আশুনে চিরকাল ভোগ করবেই। এজন্যই কোন কোন আলোমের অভিমত হচ্ছে যে, কুফরী ও শেরেকীতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে রাজত্ব-বাদশাহী করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত হওয়ার পর তা বজায় থাকতে পারে না।

يوسف ۱۲

২৩৭

ومامن دآبة ۱۲



(১১৮) আর তোমার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই জাতিসত্তায় পরিণত করতে পারতেন আর তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতো না। (১১৯) তোমার পালনকর্তা যাদের উপর রহমত করেছেন, তারা ব্যতীত সবাই চিরদিন মতভেদ করতেই থাকবে এবং এজন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমার আঞ্জাঙ্গর কথাই পূর্ণ হল যে, অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দ্বারা একযোগে ভর্তি করব। (১২০) আর আমি রসূলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলছি, যদ্বারা তোমার অন্তরকে মজবুত করছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও সুরক্ষণীয় বিষয়বস্তু এসেছে। (১২১) আর যারা ঈমান আনে না, তাদেরকে বলে দাও যে, তোমারা নিজ নিজ অবস্থায় কাজ করে যাও আমরাও কাজ করে যাই। (১২২) এবং তোমরাও অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও অপেক্ষায় রইলাম। (১২৩) আর আঞ্জাঙ্গর কাছেই আছে আসমান ও যম্বীনের গোপন তথ্য; আর সকল কাজের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে; অতএব, তাঁরই বন্দন্বী কর এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখ, আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার পালনকর্তা কিন্তু বে-খবর নন।

### সূরা ইউসুফ

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ১১১

আসীম মেহেরবান ও পরম দয়ালু আঞ্জাঙ্গর নামে শুরু।

(১) আলিফ-লা-ম-স্বা, এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত। (২) আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৩) আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমতে আমি এ কোরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (৪) যখন ইউসুফ পিতাকে বলল : পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে। সূর্যকে এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশ্যে সজ্জা করতে দেখেছি।

### আনুবাদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মতবিরোধ : নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় দিক : ১১৮তম আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে যে, আঞ্জাঙ্গ তাআলা যদি ইচ্ছা করেন, তবে সকল মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন। তাহলে সবাই মুসলমান হয়ে যেত, কোন মতভেদ থাকত না। কিন্তু নিগূঢ় রহস্যের প্রেক্ষিতে আঞ্জাঙ্গ তাআলা এ দুনিয়াতে কাউকে কোন কাজের জন্য বাধ্য করেন না, বরং তিনি মানুষকে অনেকটা এখতিয়ার দান করেছেন। যার ফলে মানুষ ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য উভয়ই করতে পারে। মানুষের মন-মানসিকতা বিভিন্ন হওয়ার কারণে তাদের মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। কল সর্বযুগেই কিছু লোক সত্য-ন্যায়ের বিরোধিতা করে আসছে। তবে যাদের উপর আঞ্জাঙ্গ তাআলা খাস রহমত করেছেন অর্থাৎ, যারা সত্যিকারভাবে নবীগণের শিক্ষাকে অনুসরণ করেছে, তারা কখনো সত্য-বিচ্যুত হন নাই।

আলোচ্য আয়াতে যে মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা হচ্ছে—নবীগণের শিক্ষা ও সত্য দ্বীনের বিরোধিতা করা। পক্ষান্তরে ওলামায়ে-দ্বীন ও মুজতাহিদ আলমগণের মধ্যে যে মতভেদ সাহাবায়ের কোরআনের যুগ হতে চলে আসছে, তা আদৌ নিন্দনীয় এবং আঞ্জাঙ্গ রহমতের পরিপন্থী নয়। বরং সেটি একান্ত অবশ্যস্বাভী, সাধারণ মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর এবং আঞ্জাঙ্গর রহমতস্বরূপ। অত্র আয়াতে পরিপ্রেক্ষিতে যারা মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহগণের মতভেদকে বিভ্রান্তিকর ও ক্ষতিকর আখ্যা দিয়েছে, তাদের উক্তি অত্র আয়াতের স্ব এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আমলের পরিপন্থী।

### সূরা ইউসুফ

চারটি আয়াত ছাড়া সমগ্র সূরা-ইউসুফ মক্কায় অবতীর্ণ। এ সূরায় হয়ত ইউসুফ (আঃ)—এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনীটি শুধুমাত্র এ সূরাতেই উল্লেখিত হয়েছে। সমগ্র কোরআনে কোথাও এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এটা একমাত্র ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কিত কাহিনীরই বৈশিষ্ট্য। এছাড়া অন্যসব আয়িয়া (আঃ)—এর কাহিনী ও ঘটনাবলী সমগ্র কোরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ডভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বিশৃঙ্খল ইতিহাস এবং অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে বিরাট শিক্ষা নিহিত থাকে। এসব শিক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মানুষের মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার চাইতে অধিক গভীর ও অনায়াসলব্ধ হয়। এ কারণেই গোটা মানবজাতি জন্মে সর্বশেষ নির্দেশনামা হিসাবে প্রেরিত কোরআন পাকে সমগ্র বিশৃঙ্খল জাতিসমূহের ইতিহাসের নির্বাচিত অধ্যায়সমূহ সন্নিবেশিত করে দেয় হয়েছে, যা মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংশোধনের জন্যে অসম্ভব ব্যবস্থাপত্র। কিন্তু কোরআন পাক বিশৃঙ্খল ইতিহাসের এসব অধ্যায়কে বিশেষ ও অনুশয় রীতিতে এমনভাবে উদ্ধৃত করেছে যে, এর পাঠক অনুভব করতে পারে না যে, এটি কোন ইতিহাসগ্রন্থ; বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন কাহিনীর যতটুকু অংশ শিক্ষা ও উপদেশের জন্যে অত্যাবশ্যক সেখান থেকে ততটুকু অংশই বিবৃত করা হয়েছে। অতঃপর অন্য কোন ক্ষেত্রে এ অংশের প্রয়োজন অনুভূত হলে পুনর্বর্ণন তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণেই এসব কাহিনীর বর্ণনায় ঘটনার সাংঘটনিক ধারাবাহিকতায় প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। কোথাও কাহিনীর প্রথম অংশ পরে এবং শেষ অংশ আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনের এ বিশেষ বর্ণনা রীতিতেই স্বতন্ত্র নির্দেশ

যে, হজরতের ইতিহাস ও অতীত ঘটনাবলী পরিবেশন করা পবিত্র কোরআনের লক্ষ্য নয়; বরং প্রত্যেক কাহিনী থেকেই কোন না কোন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা আসল লক্ষ্য।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, ইতিহাস রচনাও একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। এতে ইতিহাস রচয়িতাদের জন্যে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যে, বর্ণনা এমন স্ক্রিপ্ট না হয় যাতে পূর্ণ বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। লক্ষ্যভেদে বর্ণনা এত দীর্ঘ হওয়াও সমীচীন নয়, যাতে তা পড়া ও স্মরণ রাখা কঠিন হয়।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়াজেতে বলা হয়েছে, ইহুদীরা পরীক্ষার্থ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলেছিল : যদি আপনি সত্যিই আল্লাহর নবী হন, তবে বলুন ইয়াকুব-পরিবার সিরিয়া থেকে মিসরে কেন ফ্রান্সারিত হয়েছিল এবং ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা কি ছিল? প্রত্যুত্তরে ওহীর মাধ্যমে পূর্ণ কাহিনী অবতারণ করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মু'জেযা ও তাঁর নবুওতের একটি বড় প্রমাণ। কেননা, তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং জীবনের প্রথম থেকেই মক্কায় বসবাসকারী। তিনি কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি এবং কোন গ্রন্থও পাঠ করেননি। এতদসত্ত্বেও তওরাতে বর্ণিত আদ্যোপাশ্চ ঘটনাটি বিস্ময়করপে বর্ণনা করে

দেন। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يَأْتِي الْبُاطِلَ وَأَنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يَأْتِي الْبُاطِلَ وَأَنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يَأْتِي الْبُاطِلَ

অর্থাৎ, এগুলো সে গ্রন্থের আয়াত, যা ফলাল ও হারামের বিধি-বিধান এবং প্রত্যেক কাজের সীমা ও শর্ত বর্ণনা করে। মানুষকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্য একটি সুমম ও সরল জীবনব্যবস্থা দান করে। এগুলো অবতীর্ণ করার অসীকার তওরাতে পাওয়া যায় এবং ইহুদীরা এ সম্পর্কে অবহিতও বটে।

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

অর্থাৎ, আমি একে আরবী কোরআন হিসাবে নাথিল করেছি, হয়তো এতে তোমরা বুঝতে পারবে।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী সম্পর্কে যারা

প্রশ্ন তুলেছিল, তারা ছিল আরবের ইহুদী। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরই ভাষায় এ কাহিনী নাথিল করেছেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সত্যতা ও সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাহিনীতে বর্ণিত বিধান ও নির্দেশাবলীকে চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ, نَحْنُ نَكْتُبُ عَلَيْكَ الْحَقَّ آمِنًا এ কোরআনকে ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করে আপনার কাছে সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি। নিঃসন্দেহে আপনি ইতিপূর্বে এসব ঘটনা সম্পর্কে অনবগত ছিলেন।

এতে ইহুদীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আমার পয়গম্বরের যেভাবে পরীক্ষা নিতে চেয়েছ, তাতেও তাঁর গুণগত উৎকর্ষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা, তিনি পূর্ব থেকে নিরক্ষর এবং বিশু-ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞও ছিলেন। সুতরাং তিনি এখন যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার মাধ্যমে আল্লাহর শিক্ষা ও ওহী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ ابْنِي... অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতাকে বললেন : পিতঃ আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আরও দেখেছি যে, তারা আমাকে সেজদা করছে।

এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্ন। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : এগারোটটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ (আঃ)-এর এগার ভাই, সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা।

তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে : হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মাতা এ ঘটনার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন এবং তাঁর খালা তখন তার পিতার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। খালা এমনিতেও মায়ের সমতুল্য গণ্য হয়। বিশেষতঃ যদি পিতার ডাখা হয়ে যায়, তবে সাধারণতঃ পরিভাষায় তাকে মা-ই বলা হবে।

قَالَ لَيْتِي لَا تَقْضُ رِيَالِي عَلَى رَحْمَتِكَ فَيَكِيدُوا الْكَ  
 كِيدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ  
 يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْآيَاتِ وَيُؤَيِّمُ تَتَمَّةً  
 عَلَيْكَ وَعَلَى الْإِلِّ يَتَقَوَّبُ كَمَا اتَّبَعَهَا أَبُو يَكْرٍ مِنْ قَبْلُ  
 إِيَّاهُمْ وَإِسْحَاقُ إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ  
 وَرَحْمَتِهِ آيَاتٌ لِلْمُتَّقِينَ ۝ إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ  
 إِلَيَّ إِنِّي أَخْتَلِفُ عَلَيْكَ إِنِّي أَبَا نَبِيٍّ ضَلِيلٌ ۝ يَتَّبِعُونَ  
 لِقَوْلِ الْيُوسُفَ وَأَطَاعُوا أَوْطَارَهُمْ كَأَنَّ الْوَجْهَ آبَاءَهُمْ وَ  
 تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ ۝ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَوْ كُنَّا  
 يُوسُفَ وَالْقُوَّةَ فِي الْعِبَادِ الْيَتِيمِ لَكُنَّ نَجْمًا فِي السَّمَاءِ  
 إِنَّ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۝ قَالَ الْيُوسُفُ إِنَّا مَالِكٌ لَا تَمَسُّ عَلَى يُوسُفَ  
 وَإِنَّا لَنَصِحُونَ ۝ أَرْسَلَهُ مَعَاذَ آيَاتِهِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا  
 لَهُ لَخَفِطُونَ ۝ قَالَ إِنِّي عَازِمٌ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِمْ وَأَخَاتُ  
 أَنْ يَأْكُلَهُ الَّذِينَ يَبُؤُا وَأَنْتُمْ عَنْهُمْ غَفْلُونَ ۝ قَالَ الْيُوسُفُ  
 أَكْهَلِكُمُ الَّذِينَ يَبُؤُا وَيَعْنُ غَضَبَهُ إِذَا إِذَا الْخُسْرُونَ ۝

(৫) তিনি বললেন : বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিচয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৬) এমনভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুব পরিবার-পরিজনদের প্রতি; যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছেন। নিচয় তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৭) অবশ্য ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮) যখন তারা বলল : অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক স্নিহ অথচ আমরা একটা সংহত শক্তিবিশেষ। নিচয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভাস্তিতে রয়েছেন। (৯) হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে। (১০) তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধরূপে যাতে কোন পশিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়। (১১) তারা বলল : পিতা, ব্যাপার কি, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? আমরা তো তার হিতাকাঙ্ক্ষী। (১২) আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে ধারণ করুন— তুপিসহ খাবে এবং খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষাব্যবেক্ষণ করব। (১৩) তিনি বললেন : আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্ক্য করি যে, ব্যাঘ্র তাঁকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তার দিক থেকে গাফেল থাকবে। (১৪) তারা বলল : আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি ব্যাঘ্র তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমরা সবই হারলাম।

كَال لَيْتِي لَا تَقْضُ رِيَالِي ۝ অর্থাৎ, বৎস! তুমি এ স্বপ্ন ভাইদের

কাছে বর্ণনা করো না। আল্লাহ না করুন, তারা এ স্বপ্ন শুনে তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তোমাকে বিপর্যস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। কেননা, শয়তান হল মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে পার্শ্বিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ির লোভ দেখিয়ে মানুষকে এহেন অপকর্মে লিপ্ত করে দেয়,

স্বপ্নের তাৎপর্য স্তর ও প্রকারভেদ : সর্বপ্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে— স্বপ্নের স্বরূপ এবং তা থেকে যেসব ঘটনা ও বিষয় জানা যায়, সেগুলোর গুরুত্ব ও পর্যায়। তফসীরে মাহহারীতে কাযী সানাউল্লাহ (মক্কা) বলেন : স্বপ্নের তাৎপর্য এই যে, নিদ্রা কিংবা সংজ্ঞাহীনতার কারণে মানুষের মন যখন দেহের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে কম্পনাশক্তির পথে কিছু কিছু আকার-আকৃতি দেখতে পায়। এরই নাম স্বপ্ন। স্বপ্ন তিন প্রকার। তন্মধ্যে দু' প্রকার সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। এগুলোর কোন বাস্তবতা নেই। অবশিষ্ট একটির মৌলিকত্বের দিক দিয়ে নির্ভুল ও বাস্তব। কিন্তু এতে মাঝে মাঝে নানা উপসর্গ যুক্ত হয়ে এগুলোকেও অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য করে দেয়।

এ উক্তির ব্যাখ্যা এই যে, কোন কোন সময় মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যেসব বিষয় ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, সেগুলোই স্বপ্নে নানা আকার-আকৃতি নিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কোন কোন সময় শয়তান আনন্দদায়ক ও ভয়াবহ উভয় প্রকার দৃশ্য ও ঘটনাবলী মানুষের স্মৃতিতে জাগিয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, এ উভয় প্রকার স্বপ্নই ভিত্তিহীন ও অবাস্তব। এগুলোর কোন বাস্তব ব্যাখ্যা হতে পারে না। এতদুভয়ের প্রথম প্রকারকে حديث النفس তথা মনের সংলাপ এবং দ্বিতীয় প্রকারকে تسويل شيطان অর্থাৎ শয়তানের বিবাস্তি বলা হয়।

তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও বিশুদ্ধ। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক প্রকার ইলহাম (খোদায়ী ইশারা), যা বন্দাকে আনন্দ অথবা সুসবোধ দানের উদ্দেশ্যে করা হয়। আল্লাহ তাআলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে কোন কোন বিষয় বাল্পার মন ও মস্তিষ্কে জাগিয়ে দেন।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন একটি সংযোগ বিশেষ। এর মাধ্যমে সে তার পালনকর্তার সাথে বাক্যালাপ করার গৌরব অর্জন করে। তিবরানী বিশুদ্ধ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন— (মাহহারী)

সূফী বুয়ূর্গণের বর্ণনা অনুযায়ী এর স্বরূপ এই যে, জগতে অস্তিত্ব লাভের পূর্বে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ আকৃতি 'আলমে-মিসাল' অর্থাৎ, উপমা-জগতে বিদ্যমান থাকে, তেমনি 'মা' আনী' তথা অবস্তবচাক্ত বিঘ্নাদিরও বিশেষ আকার-আকৃতি বিদ্যমান থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মন যখন বাহ্যিক দেহের ক্রিয়া-কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে, তখন মাঝে মাঝে উপমা জগতের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং সেখানকার আকার-অবয়ব সে দেখতে পায়। এছাড়া এসব আকার-অবয়ব অদৃশ্য জগৎ থেকে দেখানো হয়। মাঝে মাঝে এগুলোতেও এমনসব উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আসল সত্যের সাথে কিছু কিছু অবাস্তব কম্পনাও মিশ্রিত হয়ে পড়ে। এ কারণে ব্যাখ্যানাতাদের পক্ষেও এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে



কোরোক্ত আকার-অবয়ব যাবতীয় উপসর্গ থেকে পরিচ্ছন্ন থাকে। তখনই সেগুলো হয় আসল সত্য। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোন কোন স্বপ্ন থাকে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ, তাতে বাস্তব ঘটনা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। প্রশংসারহস্য যদি ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হয়, তবে ঘটনা ভিন্ন আকার ধারণ করে। জই একমাত্র সে স্বপ্নই আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত ইলহাম ও বাস্তব সত্য বলে বিবেচিত হবে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে, তাতে কোন উপসর্গের সন্নিবেশ হবে না এবং ব্যাখ্যাও বিশুদ্ধ দেয়া হবে।

পয়গম্বরগণের সব স্বপ্ন ছিল এই পর্যায়ের। তাই তাদের স্বপ্নও ওহীর সম্পর্কীয়ভুক্ত। সাধারণ মুসলমানদের স্বপ্নে নানাবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তাই তা কারও জন্যে প্রমাণ হয় না। তাদের স্বপ্নে কোন কোন সময় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিগত আকার-আকৃতির মিশ্রণ সংঘটিত হয়ে যায়, কোন সময় পাপের অঙ্কুর ও মালিন্য স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে দুর্বোধ্য করে দেয় এবং মাঝে মাঝে বিবিধ কারণে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যায়ও উপনীত হওয়া যায় না।

স্বপ্নের বর্ণিত তিনটি প্রকারই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণিত। তিন বলেন :

স্বপ্ন তিন প্রকার। এক প্রকার শয়তানী। এতে শয়তানের পক্ষ থেকে কিছু কিছু বিষয় মনে জাগ্রত হয়। দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু দেখে, নিদ্রায়ও তাই সামনে আসে। তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও অসত্য। এটি নবুওয়তের ৪৬তম অংশ; অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম।

স্বপ্ন ও নবুওয়তের অংশ-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা : স্বপ্নের এ সত্য ও বিশুদ্ধ প্রকার সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে। কোন হাদীসে নবুওয়তের ৪০তম অংশ, কোন হাদীসে ৪৬তম অংশ এবং কোন হাদীসে ৪৯তম, ৫০তম এবং ৭০তম অংশ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। এসব হাদীস তফসীরে-কুরতুবীতে একত্রে সন্নিবেশিত করে ইবনে আবদুল বারের বিশ্লেষণে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এগুলোর মধ্যে কোনরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই। বরং প্রত্যেকটি হাদীস স্ব-স্থানে বিশুদ্ধ ও সঠিক। যারা স্বপ্ন দেখে, তাদের অবস্থাতেই বিভিন্নরূপ অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সত্যতা, বিশুদ্ধতা, ধর্মপরায়ণতা ও পরিপূর্ণ ঈমান দ্বারা বিভূষিত, তার স্বপ্ন নবুওয়তের ৪০ তম অংশ হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এসব গুণ কম তার স্বপ্ন ৪৬তম অথবা ৫০ তম অংশ হবে এবং যার মধ্যে এসব গুণ আরও কম তার স্বপ্ন নবুওয়তের ৭০তম অংশ হবে।

এখানে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের অংশ-এর অর্থ কি? তফসীরে মায়হারীতে এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে তেইশ বৎসর পর্যন্ত ওহী আগমন করতে থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়মাস স্বপ্নের আকারে এ ওহী আগমন করে। অবশিষ্ট পর্য্যটাল্লিশ ষাওয়্যাসিক জিবরাজিলের মধ্যস্থতায় ওহী আগমন করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের ৪৬তম অংশ। যেসব হাদীসে কম-বেশী সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতে হয় কাছাকাছি হিসাবে বলা হয়েছে, না হয় সনদের দিক দিয়ে সেসব হাদীস ধর্তব্য নয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন : স্বপ্ন' নবুওয়তের অংশ হওয়ার তাৎপর্য এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে স্বপ্নে এমন বিষয় দেখে, যা তার সাধ্যাতীত। উদাহরণতঃ কেউ দেখে যে, সে আকাশে উড়ছে। অথবা অদৃশ্য জগতের এমন কোন বিষয় দেখে, যার জ্ঞান অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

অতএব এরূপ স্বপ্নের মাধ্যমে খোদারী সাহায্য ও প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, যা প্রকৃতপক্ষে নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য। তাই স্বপ্নকে নবুওয়তের অংশ স্থির করা হয়েছে।

কাদিয়ানী দাঙ্কালের একটি বিখ্যাত বণ্ডন : এ সম্পর্কে কিছু সংক্ষেপে লোক একটি অভিনব বিবৃতিতে পতিত হয়েছে। তারা বলে : নবুওয়তের অংশ যখন দুনিয়াতে অবশিষ্ট ও প্রচলিত আছে, তখন নবুওয়তও অবশিষ্ট ও প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ এটা কোরআনের অকাটা আয়াত ও অসংখ্য সহীহ হাদীসের পরিপন্থী এক সমস্ত মুসলিম সম্মতদায়ের ক্ষতমে নবুওয়ত সম্পর্কিত সর্বসম্মত বিশ্লেষণের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ সহজ সত্যটি বুঝতে পারল না যে, কোন বস্তুর একটি অংশ বিদ্যমান থাকলে বস্তুটি বিদ্যমান থাকা জরুরী হয়ে পড়ে না। যদি কোন ব্যক্তির একটি নব অথবা একটি চুল কোথাও বিদ্যমান থাকে, তবে কেউ একথা বলতে পারে না যে, এখানে ঐ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। মেশিনের অনেক কল-কন্ডার মধ্য থেকে কোন একটি কল-কন্ডা অথবা একটি শ্চু যদি কারও কাছে থাকে এক সে দাবী করে বসে যে, তার কাছে অমুক মেশিনটি আছে, তবে বিশ্বাসী তাকে হয় মিথ্যাবাদী, না হয় আস্তা আত্মশ্রমক বলতে বাধ্য হবে।

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সত্য স্বপ্ন অবশ্যই নবুওয়তের অংশ, কিন্তু নবুওয়ত নয়। নবুওয়ত তো আবেদী নবী মোহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে।

সহীহ বুখারীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : لم يبق من النبوة الا البشرات অর্থাৎ, ভবিষ্যতে “মুবাশিরাত” ব্যতীত নবুওয়তের কোন অংশ বাকী থাকবে না। সাহাবায়ে কেয়াম আরম্ভ করলেন : “মুবাশিরাত” বলতে কি বোঝায়? উত্তর হল : সত্য স্বপ্ন। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুওয়ত কোন প্রকারে অথবা কোন আকারেই অবশিষ্ট নেই। শুধুমাত্র এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অবশিষ্ট আছে যাকে মুবাশিরাত অথবা সত্য স্বপ্ন বলা হয়।

কাকের ও কাসেক স্বভাবের স্বপ্নও সত্য হতে পারে : মাঝে মাঝে পাপাচারী, এমন কি কাকের ব্যক্তিও সত্য স্বপ্ন দেখতে পারে। একথা কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং অভিজ্ঞতায় জানা। সূরা ইউসূফে হযরত ইউসূফ (আঃ)-এর দু'জন কামা-সঙ্গীর স্বপ্ন সত্য হওয়া এবং মিসর-সম্রাটের স্বপ্ন ও তা সত্য হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ তারা সবাই ছিল অমুসলমান। হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে পারস্য সম্রাটের স্বপ্নের কথা বর্ণিত আছে, যা সত্যে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ পারস্য সম্রাট মুসলমান ছিলেন না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ফুফু আতেকা কাকের ঠাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে সত্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ ছাড়া কাকের বাদশাহ্ বখতে নবুওয়তের স্বপ্ন সত্য ছিল, যার ব্যাখ্যা হযরত দানিয়াল (আঃ) দিয়েছেন।

এতে বোঝা যায় যে, সত্য স্বপ্ন দেখা এবং তদনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া এতটুকু বিষয়ই কারও সং, ধার্মিক এমনকি মুসলমান হওয়ারও প্রমাণ নয়। তবে এটা ঠিক যে, সং ও সাধু ব্যক্তিদের স্বপ্ন সাধারণতঃ সত্য হবে—এটাই আল্লাহর সাধারণ রীতি। কাসেক ও পাপাচারীদের সাধারণতঃ মনের স্ফলপ ও শয়তানী প্ররোচনা ধরনের মিথ্যা স্বপ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এর বিপরীতও হওয়া সম্ভব।

মোটকথা, সত্য স্বপ্ন সাধারণ মুসলমানদের জন্যে হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সুসংবাদ কিংবা হুশিয়ারীর চাইতে অধিক মর্যাদা রাখে না। এটা

স্বয়ং তাদের জন্যে কোন ব্যাপারে প্রমাণরূপে গণ্য নয় এবং অন্যের জন্যেও নয়। কোন কোন অজ্ঞ লোক এ ধরণের স্বপ্ন দেখে নানা রকম কুমন্ত্রণায় লিপ্ত হয়। কেউ একে নিজের ওলীভূতের লক্ষণ মনে করতে থাকে এবং কেউ স্বপ্নলব্ধ বিষয়াদিকে শরীয়তের নির্দেশের মর্যাদা দিতে থাকে। এসব বিষয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; বিশেষতঃ যখন একথাও জানা হয়ে গেছে যে, সত্য স্বপ্নের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে প্রবৃত্তিগত অথবা শয়তানী অথবা উভয় প্রকার ধ্যান-ধারণার মিশ্রণ আসতে পারে।

**স্বপ্ন প্রত্যেকের কাছে বর্ণনা করা ঠিক নয় :** **مَّا سَأَلْنَا عَنْهُ** আয়াতে ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-কে স্বীয় স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহনুভূতিশীল নয়—এরূপ লোকের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করা উচিত নয়। এছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী নয়—এমন ব্যক্তির কাছেও স্বপ্ন ব্যক্ত করা সঙ্গত নয়।

**মাসআলা :** এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কষ্টদায়ক বিপজ্জনক স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করতে নেই। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র দয়া ও সহনুভূতির উপর ভিত্তিশীল—আইনগত হারাম নয়। সহীহ হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, ওহদ মুক্দের সময় রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার তরবারি 'মূলফাকার' ভেঙ্গে গেছে এবং আরও কিছু গাভীকে জবাই হতে দেখেছি। এর ব্যাখ্যা ছিল হযরত হামযা (রাঃ)—সহ অনেক মুসলমানের শাহাদত বরণ। এটা একটা আশু মারাত্মক বিপর্যয় সম্পর্কিত ইঙ্গিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহাবীদের কাছে এ স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন।—(কুরতুবী)

**মাসআলা :** এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, মুসলমানকে অপরের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে অপরের কোন মন্দ অভ্যাস অথবা কুনিয়ত প্রকাশ করা জায়েয। এটা গীবত তথা অসাক্ষাতে পরনির্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণতঃ কেউ জানতে পারল যে, যাদেদ বকরের গৃহে চুরি করার অথবা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। এমতাবস্থায় বকরকে অবহিত করা তার কর্তব্য। এটা গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না। আয়াতে ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-কে বলে দিয়েছেন যে, ভাইদের পক্ষ থেকে তার প্রাণ নাশের আশঙ্কা রয়েছে।

**ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-কে কতিপয় নেয়ামত দানের ওয়াদা করেছেন।** **وَكُنَّا لِكَافِرِينَ** অর্থাৎ, আল্লাহ স্বীয় নেয়ামত ও অনুগ্রহরাজির জন্যে আপনাকে মনোনীত করবেন। মিসর দেশে রাজ্য, সম্মান ও ধন-সম্পদ লাভের মাধ্যমে এ ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করেছে। দ্বিতীয়, **وَيُؤْتِيكَ مِنْ تَحْتِهَا نَهْرًا مَجْرًا** এখানে **احاديث** বলে মানুষের স্বপ্ন বোঝান হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। এতে আরও জানা গেল যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, যা আল্লাহ তাআলা কোন কোন ব্যক্তিকে দান করেন। সবাই এর যোগ্য নয়।

**মাসআলা :** তফসীরে কুরতুবীতে শাদ্দাদ ইবনুল-হাদের উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা চল্লিশ বৎসর পর প্রকাশ পায়। এতে বোঝা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্বপ্ন ফলে যাওয়া ক্ষরী নয়।

**তৃতীয় ওয়াদা** **وَيُؤْتِيكَ مِنْ تَحْتِهَا نَهْرًا مَجْرًا**—অর্থাৎ, আল্লাহ আপনার প্রতি স্বীয় নেয়ামতপূর্ণ করবেন। এতে নবুওয়ত দানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং

পরবর্তী বাক্যসমূহেও এর প্রতি ইঙ্গিত আছে। **وَأَنْتَ كَانَتْ لَكِ الْوَيْلَةُ** অর্থাৎ, যেভাবে আমি স্বীয় নবুওয়তে নেয়ামত আপনার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি ইতিপূর্বে পূর্ণ করেছি। এতে এদিকেও ইশারা হয়ে গেছে যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত শাস্ত্র যেমন ইউসুফ (আঃ)-কে দান করা হয়েছিল, তেমনিভাবে ইবরাহীম ও ইসহাক (আঃ)-কেও শেখানো হয়েছিল।

**আয়াতের শেষে বলা হয়েছে :** **إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানবান, সুবিজ্ঞ। কাউকে কোন শাস্ত্র শেখানো উন্ন পক্ষে কঠিন নয় এবং তিনি প্রত্যেককেই তা শেখান না। বরং বিজ্ঞতা অনুযায়ী বেছে বেছে কোন কোন ব্যক্তিকে এ কৌশল শিখিয়ে দেন।

উল্লেখিত আয়াতসমূহের ৭নং আয়াতে ঘৃশিয়ার করা হয়েছে যে, এ সূরায় বর্ণিত ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীকে শুধুমাত্র একটি কাহিনীর নিরিখে দেখা উচিত নয়; বরং এতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের জন্যে আল্লাহ তাআলার অপর শক্তির বড় বড় নিদর্শন ও নির্দেশাবলী রয়েছে।

এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, যেসব ইহুদী পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সঃ)-কে এ কাহিনী জিজ্ঞেস করেছিল, তাদের জন্যে এতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) যে সময় মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন এবং তাঁর সংবাদ মদীনায় পৌঁছেছিল, তখন মদীনার ইহুদীরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যে একদল লোক মক্কায় প্রেরণ করেছিল। তারা অস্পষ্ট ভঙ্গিতে এরূপ প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি সত্য নবী হলে বলুন, কোন পয়গম্বরের এক পুত্রকে সিরিয়া থেকে মিসরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তার বিরহ-ব্যাখায় ক্রন্দন করতে করতে পিতা অন্ধ হয়ে যায়?

জিজ্ঞাসার জন্যে এ ঘটনাটি মনোনীত করার পেছন কারণ ছিল এই যে, এ ঘটনা সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ ছিল না এবং মক্কায় কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাতও ছিল না। তখন মক্কায় কিতাবী সম্প্রদায়ের কেউ বাস করত না যে, তওরাত ও ইনজীলের বরাতে তার কাছ থেকে এ ঘটনার কোন অংশবিশেষ জানা যেত। বলাবাহুল্য, তাদের এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ণ সূরা ইউসুফ অবতীর্ণ হয়। এতে হযরত ইয়াকুব ও ইউসুফ (আঃ)-এর সম্পূর্ণ কাহিনী এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তওরাত ও ইনজীলেও তেমনিটি হয়নি। তাই এর বর্ণনা ছিল রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি প্রকাশ্য মু'জ্জ্বা।

আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইউসুফসহ হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বার জন পুত্র-সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান-সন্ততি হয় এবং বেশ বিস্তার লাভ করে। ইয়াকুব (আঃ)-এর উপাধি ছিল 'ইসরাঈল'। তাই বারটি পরিবার সবাই 'বনী-ইসরাঈল' নামে খ্যাত হয়।

বারপুত্রের মধ্যে দশ জন জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী লাইয়্যা বিন্তে লাইয়্যানের গর্ভে জন্মলাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পর ইয়াকুব (আঃ) লাইয়্যার ভগিনী রাহীলকে বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দু'পুত্র ইউসুফ ও বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই ইউসুফ (আঃ)-এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বেনিয়ামিন এবং অবশিষ্ট দশ জন বৈমাত্রেয় ভাই। ইউসুফ জননী রাহীলও বেনিয়ামিনের জন্মের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।—(কুরতুবী)

৮নং আয়াত থেকে ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী শুরু হয়েছে। ইউসুফ

(আঃ)—এর ভ্রাতারা পিতা ইয়াকুব (আঃ)—কে দেখল যে, তিনি ইউসুফের প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাখাচাড়া দিয়ে উঠে। এটাও সম্ভবপর যে, তারা কোনরূপে ইউসুফ (আঃ)—এর স্বপ্নের বিষয়ও অবগত হয়েছিল, যদ্বন্ধন তারা ইউসুফ (আঃ)—এর বিরাট যথার্থ্যের কথা টের পেয়ে তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। তারা পরস্পর বলাবলি করল : আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের ভুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বেনিয়ামিনকে অধিক ভালবাসেন। অথচ আমরা দশ জন এবং তাদের জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হল এ বিষয় অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মহব্বত করা। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় ইউসুফকে হত্যা কর, না হয় এমন দূরদেশে নির্ধারিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

৯ নং আয়াতে ভাইদের পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে। কেউ মত প্রকাশ করল যে, ইউসুফকে হত্যা করা হোক। কেউ বলল : তাকে কোন দ্রব্ধরূপে গভীরে নিক্ষেপ করা হোক—যাতে মাঝখান থেকে এ কন্টক দূর হয়ে যায় এবং পিতার সমগ্র মনোযোগ তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। হত্যা কিংবা কূপে নিক্ষেপ করার কারণে যে গোনাহ হবে, তার প্রতিকার এই যে, পরবর্তীকালে তওবা করে তোমরা সাধু হয়ে যেতে পারবে। আয়াতের **وَكُلُّوْا مِنْ بَعْدِي وَتَوَّابِعِيْنَ** বাক্যের এক অর্থ তাই বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর তোমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। কেননা, পিতার মনোযোগের কেন্দ্র শেষ হয়ে যাবে। অথবা অর্থ এই যে, হত্যার পর পিতা-মাতার কাছে দোষ স্বীকার করে তোমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।

ইউসুফ (আঃ)—এর ভ্রাতারা যে পয়গম্বর ছিল না, উপরোক্ত পরামর্শ তার প্রমাণ। কেননা, এ ঘটনায় তারা অনেকগুলো কবির গোনাহ করেছে। একজন নিরপরাধকে হত্যার সংকল্প, পিতার অবাধ্যতা ও তাঁকে কষ্ট প্রদান, চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ ও মিথ্যা চক্রান্ত ইত্যাদি! বিজ্ঞ আলেমগণের বিশ্লেষণ অনুযায়ী পয়গম্বরগণ দ্বারা নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও এরূপ গোনাহ হতে পারে না।

১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে : ভ্রাতাদের মধ্যেই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে বলল : ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি কিছু করতেই হয় তবে, কূপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ কর, যেখানে সে জীবিত থাকে এবং পশিক যখন কূপে আসে, তখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অপরদিকে তাকে নিয়ে তোমাদেরকে কোন দূরদেশে যেতে হবে না। কোন কাফেলা আসবে, তারা স্বয়ং তাকে সাথে করে দূর-দূরান্তে পৌঁছে দেবে।

এ অভিমত প্রকাশকারী ছিল তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াকুব। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, সবার মধ্যে রুবীল ছিল জ্যেষ্ঠ। সে-ই এ অভিমত দিয়েছিল। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন ইউসুফ (আঃ)—এর ছোট ভাই বেনিয়ামিনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিল : আমি ফিরে গিয়ে পিতাকে কিভাবে মুখ দেখাব? তাই আমি কেনানে ফিরে যাব না।

ইমাম কুরতুবী এ স্থলে **لِقَطٍ** এর বিস্তারিত বিধানাবলী বর্ণনা করেছেন। এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই। তবে এ সম্পর্কে

একটি মৌলিক বিষয় বুঝে নেয়া দরকার যে, ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও মালের হেফাজত পথ-ঘাট ও সড়ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ ইত্যাদি একমাত্র সরকারী বিভাগসমূহের দায়িত্ব নয়; প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষমতায় এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। পথ-ঘাটে ও সড়কে দাঁড়িয়ে অথবা নিজের কোন আসবাবপত্র ফেলে দিয়ে যারা পশিকদের চলার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি মুসলমানদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তার জেহাদও গ্রহণীয় নয়। এমনভাবে রাস্তায় কোন বস্তু পড়ে থাকার কারণে যদি অপরের কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে; যেমন কাঁটা, কাঁচের টুকরো, পাথর ইত্যাদি, তবে এগুলোকে সরানো শুধু ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষেরই দায়িত্ব নয়; বরং প্রত্যেক মুসলমানকেই এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং যারা এ কাজ করে, তাদের জন্যে অশেষ প্রতিদান ও সওয়াবের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

এ মূলনীতি অনুযায়ীই কারও হারানো মাল পেলে তা আত্মসাত না করাই শুধু তার দায়িত্ব নয়; বরং এটাও তার দায়িত্ব যে, মালাটি উঠিয়ে সমস্তে রেখে দেবে এবং ঘোষণা করে মালিকের সন্ধান নেবে। সন্ধান পাওয়া গেলে এবং লক্ষণাদি বর্ণনার পর যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ মাল তারই; তবে তাকে প্রত্যর্পণ করবে। পক্ষান্তরে ঘোষণা ও খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও যদি মালিক না পাওয়া যায় এবং মালের গুরুত্ব অনুযায়ী অনুমিত হয় যে, মালিক আর তালাশ করবে না, তবে প্রাপক নিঃস্ব দরিদ্র হলে নিজেই তা ভোগ করতে পারবে। অন্যথায় ফকীর-মিসকীনকে দান করে দেবে। উভয় অবস্থায় সেটি প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে দানরূপে গণ্য করা হবে। দানের সওয়াব সে-ই পাবে; যেন পরকালের হিসাবে সেটি তার নামেই জমা করে দেয়া হবে।

এগুলো হচ্ছে জনসেবা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতি। এগুলোর দায়িত্ব মুসলিম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আফসোস! মুসলমানরা নিজেদের দীনকে বুঝলে এবং তা যথাযথ পালন করলে বিশ্ববাসীর চোখ খুলে যাবে। তারা দেখবে যে, সরকারের বড় বড় বিভাগ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, তা অনায়াসে কিভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়।

১১ ও ১২ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভাইয়েরা পিতার কাছে এরূপ ভাষায় আবেদন পেশ করল : আকবাজান। ব্যাপার কি যে, আপনি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের প্রতি আস্থা রাখেন না, অথচ আমরা তার পুরোপুরি হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে-ও স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলা করতে পারে। আমরা সবাই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব।

তাদের এই আবেদন থেকেই বোঝা যায় যে, তারা ইতিপূর্বেও এ ধরনের আবেদন কোন সময়ে করেছিল, যা পিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাই এবার কিঞ্চিৎ জোর ও পীড়াপীড়ি সহকারে পিতাকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ আয়াতে হযরত ইয়াকুব (আঃ)—এর কাছে প্রমোদ-ভ্রমণ এবং স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেননি। তিনি শুধু ইউসুফকে তাদের সাথে দিতে ইতস্ততঃ করেছেন, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এতে বোঝা গেল যে, প্রমোদ ভ্রমণ ও খেলাধুলা বিধিবদ্ধ সীমার ভেতরে নিষিদ্ধ নয়, বরং সহীহ হাদীস থেকেও এর বৈধতা জানা

যায়। তবে শর্ত এই যে, খেলাধুলায় শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাতে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘিত হতে পারে এমন কোন কিছুই মিশ্রণও উচিত নয়।—(কুরত্ববী)

ইউসুফ (আঃ)—এর ভ্রাতারা যখন আগামীকাল ইউসুফকে তাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে প্রেরণের আবেদন করল, তখন ইয়াকুব (আঃ) বললেন : তাকে প্রেরণ করা আমি দু' কারণে পছন্দ করি না। প্রথমতঃ এ নয়নের মণি আমার সামনে না থাকলে আমি শান্তি পাই না। দ্বিতীয়তঃ আশঙ্কা আছে যে, জঙ্গলে তোমাদের অসাধনতার মুহুর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে।

বাঘের আশঙ্কা হওয়ার কারণ এই যে, কেনোনে বাঘের বিস্তর প্রাদুর্ভাব ছিল। কিংবা ইয়াকুব (আঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপর আছেন। নীচে পাহাড়ের পাদদেশে ইউসুফ (আঃ)। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাকে ধরারও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, কিন্তু একটি বাঘই এগিয়ে এসে তাঁকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর ইউসুফ (আঃ) মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেন।

এর ব্যাখ্যা এভাবে প্রকাশ পায় যে, দশটি বাঘ ছিল দশ জন ভাই এবং যে বাঘটি তাকে ধরার হাত থেকে রক্ষা করে, সে ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেয়ার অর্থ কুপের মধ্যে নিষ্কিপ্ত হওয়া।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইয়াকুব (আঃ) স্বয়ং এ ভাইদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করেছিলেন এবং তাদেরকেই বাঘ বলেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ওদের কাছে এই কথা প্রকাশ করেননি।—(কুরত্ববী)

ভ্রাতারা ইয়াকুব (আঃ)—এর কথা শুনে বলল : আপনার এ ভয়ভীতি অমূলক। আমাদের দশ জনের শক্তিশালী দল তার হেফাজতের জন্যে বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের সবার বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘেই তাকে খেয়ে ফেলে, অস্তিত্বই নিষ্কল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দ্বারা কোন কাজের আশা করা যেতে পারে ?

হযরত ইয়াকুব (আঃ) পয়গম্বর সুলভ গাষ্ট্রার্থের কারণে পুত্রদের সামনে একথা প্রকাশ করলেন না যে, আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করি। কারণ, এতে প্রথমতঃ তাদের মনোকষ্ট হত, দ্বিতীয়তঃ পিতার এরূপ বলার পর ভ্রাতাদের শত্রুতা আরও বেড়ে যেতে পারত। ফলে এখন ছেড়ে দিলেও অন্য কোন সময় কোন হলছুতায় তাকে হত্যা করার ফিকিরে থাকত। তাই তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু ভাইদের কাছ থেকে অস্বীকারও নিয়ে নিলেন, যাতে ইউসুফের কোনরূপ কষ্ট না হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুবীল অথবা ইয়াহুদার হাতে বিশেষ করে তাকে সোপর্দ করে বললেন : তুমি তার ক্ষুধা-ভৃক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যাপারে দেখা-শোনা করবে এবং শীঘ্র ফিরিয়ে আনবে। ভ্রাতারা পিতার সামনে ইউসুফকে কাঁধে তুলে নিল এবং পালাক্রমে সবাই উঠাতে লাগল। কিছুদূর

পর্যন্ত হযরত ইয়াকুবও (আঃ) তাদেরকে বিদায় দেয়ার জন্যে গেলেন।

কুরত্ববী ঐতিহাসিক রেওয়াজের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তারা যখন ইয়াকুব (আঃ)—এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন ইউসুফ (আঃ) যে ভাইয়ের কাঁধে ছিলেন, সে তাকে মাটিতে ফেলে নিল। তখন ইউসুফ (আঃ) পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন, কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাথে দৌড়াতে অক্ষম হয়ে অন্য একজন ভাইয়ের আশ্রয় নিলেন। সে কোন রূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করার তৃতীয়, চতুর্থ এমনিভাবে প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সবাই উত্তর দিল যে, 'তুই যে এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র-সূর্যকে দেখা করতে দেখেছিস, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোকে সাহায্য করবে।'

কুরত্ববী এর ভিত্তিতেই বলেন যে, এ থেকে জানা গেল, ভাইয়েরা কোন না কোন উপায়ে ইউসুফ (আঃ)—এর স্বপ্নের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। সে স্বপ্নই তাদের তীব্র ক্রোধ ও কঠোর ব্যবহারের কারণ হয়েছিল।

অবশেষে ইউসুফ (আঃ)—ইয়াহুদাকে বললেন : আপনি জ্যেষ্ঠ। আপনিই আমার দুর্বলতা ও অল্পবয়স্কতা এবং পিতার মনোকষ্টের কথা চিন্তা করে দয়ার্থ হোন। আপনি ঐ অস্বীকার স্মরণ করুন, যা পিতার সাথে করেছিলেন। একথা শুনে ইয়াহুদার মনে দয়ার সঞ্চার হল এবং তাকে বললঃ যতক্ষণ আমি জীবিত আছি এসব ভাই তোকে কোন কষ্ট দিতে পারবে না।

ইয়াহুদার অন্তরে আল্লাহ তাআলা দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত করে দিলেন। সে অন্যান্য ভাইকে সম্বোধন করে বলল : নিরপরাধকে হত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহকে ভয় কর এবং বালককে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চল। তবে তার কাছ থেকে অস্বীকার নিয়ে নাও যে, সে পিতার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করবে না।

ভাইয়েরা উত্তর দিল : আমরা জানি, তোমার উদ্দেশ্য কি। তুমি পিতার অন্তরে নিজের মর্যাদার আসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও। শুনে রাখ, যদি তুমি আমাদের ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হও, তবে আমরা তোমাকেও হত্যা করব। ইয়াহুদা দেখল যে, নয় ভাইয়ের বিপরীতে সে একা কিছুই করতে পারবে না। তাই সে বলল : তোমরা যদি এ বালককে নিপাত করতে মনস্থ করে থাক, তবে আমার কথা শোন। নিকটেই একটি প্রাচীন কূপ রয়েছে। এতে অনেক ঝোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। সর্প, বিছু ও হরেক রকমের ইতর প্রাণী এখানে বাস করে। তোমরা তাকে কূপে ফেলে দাও। যদি কোন সর্প ইত্যাদি দর্শন করে তাকে শেষ করে দেয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ এবং নিজ হাতে হত্যা করার দোষ থেকে তোমরা মুক্ত হলে। পক্ষান্তরে যদি সে জীবিত থাকে, তবে হয়তো কোন কাফেলা এখানে আসবে এবং পানির জন্য কূপে বলতি ফেলবে। ফলে সে বের হয়ে আসবে। তারা তাকে সাথে করে অন্য কোন দেশে পৌঁছিয়ে দেবে। এমতাবস্থায়ও তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

## আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ প্রস্তাবে ভাইয়েরা সবাই একমত হল। এ বিষয়টি তৃতীয় আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهَا وَاجْتَمَعُوا أَن يَجْعَلُوا فِي عَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

অর্থাৎ, ভাইয়েরা যখন ইউসুফ(আঃ)-কে জঙ্গলে নিয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে সবাই ঐকমত্যে পৌঁছল, তখন আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ)-কে সংবাদ দিলেন যে, একদিন আসবে, যখন তুমি ভাইদের কাছে তাদের এ কু-কর্মের কথা ব্যক্ত করবে। তারা তখন কিছুই বুঝতে পারবে না।

ইমাম কুরতুবী বলেন : এ ওহী সম্পর্কে দু'প্রকার ধারণা সম্ভবপর। (এক) কূপে নিক্ষেপ হওয়ার পর তাঁর সাদৃশ্য ও মুক্তির সুসংবাদ দানের জন্যে এ ওহী আগমন করেছিল। (দুই) কূপে নিক্ষেপ হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ)-কে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী বলে দিয়েছিলেন। এতে আরও বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে ধ্বংস হওয়ার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমনি পরিস্থিতি দেখা দেবে যে, তুমি তাদের তিরস্কার করার সুযোগ পাবে; অথচ তারা তোমাকে চিনবেও না যে, তুমিই তাদের ভাই ইউসুফ।

ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি শৈশবে অবতীর্ণ এ ওহী সম্পর্কে তফসীর-মাযহরীতে বলা হয়েছে যে, এটা নবুওয়তের ওহী ছিল না। কেননা, নবুওয়তের ওহী চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে অবতীর্ণ হয়। বরং এ ওহীটি ছিল এ ধরনের, যেমন মুসা (আঃ)-এর জননীকে ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করানো হয়েছিল। ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি নবুওয়তের ওহীর আগমন মিসর পৌঁছাও যৌনানে পদাৰ্পণের পর শুরু হয়েছিল। বলা হয়েছে :  
وَكُنَّا لَكُمْ آتِدَاءَ آتِدَاءَ حُكْمًا وَعِلْمًا :  
ইবনে জরীর, ইবনে আবীহাতেম প্রমুখ একে ব্যতিক্রমধর্মী নবুওয়তের ওহীই আখ্যা দিয়েছেন; যেমন ঈসা (আঃ)-কে শৈশবেই নবুওয়তের ওহী দান করা হয়েছিল। — (মাযহরী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : মিসর পৌঁছার পর আল্লাহ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-কে স্বীয় অবস্থা জানিয়ে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট খবর পাঠাতে ওহীর মাধ্যমে নিবেদন করে দিয়েছিলেন। — (কুরতুবী) এ কারণেই ইউসুফ (আঃ)-এর মত একজন পয়গম্বর জেল থেকে মুক্তি এবং মিসরের রাজত্ব লাভ করার পরও বৃদ্ধ পিতাকে স্বীয় নিরাপত্তার সংবাদ পৌঁছিয়ে নিশ্চিত করার কোন ব্যবস্থা করেননি।

এ কর্মপন্থার মধ্যে আল্লাহ তাআলার কি কি রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা জানার সাধ্য কি? সম্ভবতঃ আল্লাহ হাড়া অন্য যে কোন কিছুই প্রতি অপরিসীম ভালবাসা রাখা যে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়, এ বিষয়ে ইয়াকুব (আঃ)-কে সতর্ক করাও এর লক্ষ্য ছিল। এ হাড়া শেষ পর্যন্ত যাত্রাপ্রকারীর বেশে ভাইদেরকেই ইউসুফ (আঃ)-এর সামনে উপস্থিত করে তাদেরকেও তাদের পূর্বকৃত দূর্কর্মের কিছু শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদগণ এস্থলে ইউসুফ (আঃ)-কে কূপে

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهَا وَاجْتَمَعُوا أَن يَجْعَلُوا فِي عَيْبَتِ الْجُبِّ  
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ  
وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبِينُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا  
نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَا  
أَنْتَ يَبُوءُ مِنَّا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءَهُ وَعَلَى قَيْمِيضِهِ  
يَدَايَ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّيْتُ لَكُمُ الْفَصْلَ فَأَمْشُوا وَاصِفُوا  
حِيمِيلَ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاصِفُوا وَسَاءَ مَا يَصِفُونَ  
فَأَسْرَوْهُ وَارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ لِيَنْجُو هَذَا غُلَامٌ  
وَأَسْرُوهُ بِضَاعَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْعَلِينَ  
بَيْنَ يَدَيْهِ دِرَاهِمٌ مَعْدُودَةٌ وَكَانُوا فِي ذَمِّ الْكَافِرِينَ  
وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ  
عَسَىٰ أَنْ يَتَّقَنَا فَأُوْخَافُهَا وَلَئِن كُنَّا لَمَنَّاتٍ  
فِي الْأَرْضِ فَلْيَعْلَمَنَّ مِنَ تَابِئِيلِ الْكَادِبِينَ وَاللَّهُ غَالِبٌ  
عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَئِن كُنَّا لَلْكَافِرِينَ وَكَانُوا لَمَنَّاتٍ  
أَشَدَّ آتِنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

(১৫) অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে চলল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল এবং আমি তাকে ইঙ্গিত করলাম যে, তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা বলবে এমতাবস্থায় যে, তারা তোমাকে চিনবে না। (১৬) তারা রাতের বেলায় কাদতে কাদতে পিতার কাছে এল। (১৭) তারা বলল : পিতঃ আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে অস্বাভ-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। অতঃপর তাকে বাধে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। (১৮) এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। বললেন : এটা কখনই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন ছবর করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা কর্না করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল। (১৯) এবং একটি কাকোলা এল। অতঃপর তাদের পানি সস্ত্রাহককে প্রেরণ করল। সে বলটি ফেলল। বলল : কি আনন্দের কথা। এ তো একটি কিশোর। তারা তাকে পঞ্চাশত্ব গণ্য করে গোপন করে ফেলল। আল্লাহ খুব জানেন যা কিছু জ্ঞাত করেছিল। (২০) ওরা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল গুণাগুণটি স্বয়ংক দেহরহাম এবং তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল। (২১) মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল : একে সম্মানে রাখ। সম্ভবতঃ সে আমাদের কাছে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এ জন্যে যে তাকে বাকাদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। আল্লাহ নিছ কাঙ্খে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (২২) যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল, তখন তাকে প্রজ্ঞা ও যুগপতি দান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই।

নিক্ষেপ করার ঘটনা বর্ণনা শ্রমক্ষে বলেন : যখন ওরা তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করতে লাগল, তখন তিনি কূপের প্রাচীর ছড়িয়ে ধরলেন। তাইয়েরা তার জামা খুলে তদ্বারা হাত বেঁধে দিল। তখন ইউসূফ (আঃ) পুনরায় তাদের কাছে দয়া তিক্তা চাইলেন। কিন্তু তখনও সেই একই উত্তর পাওয়া গেল যে, যে এগারটি নক্ষত্র তোকে সেজন্য করে, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোর সাহায্য করবে। অতঃপর একটি বালতিতে রেখে তা কূপে ছাড়তে লাগল। মাঝপথে যেতেই উপর থেকে রশি কেটে দিল। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং ইউসূফের হেফাজত করলেন। পানিতে পড়ার কারণে তিনি কেনরূপ আঘাত পাননি। নিকটেই একশও তামসন প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি সুস্থ ও বহুল ভবিষ্যতে তার উপর বসে গেলেন। কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে, জিবরঈল (আঃ) আল্লাহ্‌র আদেশ পেয়ে তাঁকে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়ে দেন।

ইউসূফ (আঃ) তিন দিন কূপে অবস্থান করলেন। ইয়াহুদা প্রত্যহ গোপনে তাঁর জন্যে কিছু খাদ্য আনত এক বালতির সাহায্যে তাঁর কাছে পৌঁছে দিত।

وَكَلَّمَآيَاهُفَرَسَةًيَبْكُونَ

অর্থাৎ, সন্ধ্যাকোয় তারা ক্রন্দন করতে করত পিতার নিকট পৌঁছল। ইয়াকুব (আঃ) ক্রন্দনের শব্দ শুনে বাইরে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কি? তোমাদের ছাগপালের উপর কেউ আক্রমণ করেনি তো? ইউসূফ কোথায়? তখন তাইয়েরা বলল :

قَالُوايَايَاكَأَنذَمَّيْنَاكَفَتَيْنٍوَوَكَلَّمَآيَاهُفَرَسَةًمَعْلَمًا

الْمَلِكِوَمَاكَانَتْيُؤْتِينَكُنَاوَكَلَّمَآيَاهُفَرَسَةًمَعْلَمًا

অর্থাৎ, পিতা, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম এবং ইউসূফকে আসবাবপত্রের কাছে রেখে দিলাম। ইতিমধ্যে বাঘ এসে ইউসূফকে খেয়ে ফেলেছে। আমরা স্বত সত্যবাদীই হই; কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না।

ইবনে আরাবী ‘আহ্‌ফাসু-কোরআনে’ বলেন : পারম্পরিক (দৌড়) প্রতিযোগিতা শরীয়তসিদ্ধ এবং একটি উত্তম খেলা। এটা জেহাদেও কাজে আসে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (শাঃ) স্বয়ং এ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। অনু-প্রতিযোগিতা করানো (অর্থাৎ বৌদ্ধদৌড়)ও প্রমাণিত রয়েছে। সাহাবায়ে কোরামের মধ্যে সালামা ইবনে আকওয়া’ জনৈক ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন।

উল্লেখিত আয়াত ও রেওয়াজেত দ্বারা আসল বৌদ্ধদৌড়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। এছাড়া বৌদ্ধদৌড় ছাড়া দৌড়, তীরে লক্ষ্যভেদ ইত্যাদিতেও প্রতিযোগিতা করা বৈধ। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে তৃতীয় পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করাও জায়েয। কিন্তু পরস্পর হার-জিতে কোন টাকার অংশ শর্ত করা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা কোরআন পাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আঙ্ককাল বৌদ্ধদৌড়ের স্বত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তার কোনটিই জুয়া থেকে মুক্ত নয়। তাই এগুলো হারাম ও নাহাজয়েয।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, ইউসূফ (আঃ)-এর বাতারা পারম্পরিক আলোচনার পর অবশেষে তাকে একটি অন্ধকূপে ফেলে দিল এবং পিতাকে এসে বলল যে, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে অতঃপর কাহিনী এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وَجَاءُو عَلَى قَيْمِيئَةٍ يَبْكُونَ  
অর্থাৎ, ইউসূফ (আঃ)-এর বাতারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে এনেছিল, যাতে পিতার মনে কিছুমাত্র সন্দেহে পারে যে, বাঘই তাকে খেয়ে ফেলেছে।

কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাদের মিথ্যা ফাঁস করে দেয়ার জন্যে তাদেরকে একটি জরুরী বিষয় থেকে গাফেল করে দিয়েছিলেন। তারা যদি রক্ত লাগানোর সাথে সাথে জামাটিও ছিন্-বিচ্ছিন্ করে দিত, তবে ইউসূফকে বাঘে খাওয়ার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত। কিন্তু তারা অক্ষত ও অক্ষত জামায় ছাগল ঘানার রক্ত লাগিয়ে পিতাকে ধোকা দিতে চাইল। ইয়াকুব (আঃ) অক্ষত ও আন্ত জামা দেখে বললেন : বাঘরা, এ বাঘ কেমন রক্ত ও বুদ্ধিমান ছিল যে, ইউসূফকে তো খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু জামার কোন অংশ ছিন্ হতে দেখিনি।

এভাবে ইয়াকুব (আঃ)-এর কাছে তাদের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে গেল। তিনি বললেন :

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْأَنْفُسُكُمْأَمْرًا قَصْدًاوَجَيْبِيْنَوَاللَّهِ الشُّكْرَانِ  
عَلَى مَاوَصَّوْنُوْ

- অর্থাৎ, ইউসূফকে বাঘে খায়নি; বরং তোমাদেরই মন একটি বিষয় ষাড়া করেছে। এখন আমার জন্যে উত্তম এই যে, শৈর্যধারণ করি এক তোমরা যা বল, তাতে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করি।

মাসআলা : ইয়াকুব (আঃ) জামা অক্ষত হওয়া দ্বারা ইউসূফ বাতাদের মিথ্যা সপ্রমাণ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, বিচারকের উচিত, উভয় পক্ষের দাবী ও যুক্তি প্রমাণের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আলামতের প্রতিও লক্ষ্য রাখা।

মাওয়াজদি বলেন : হযরত ইউসূফের জামাও কিছু আচার্জনক বিষয়াদির স্মারক হয়ে রয়েছে। তিনটি বিরাট ঘটনা এ জামার সাথে জড়িত রয়েছে।

প্রথম ঘটনা হল, রক্ত রঞ্জিত করে পিতাকে ধোকা দেয়া এবং জামার সাক্ষ্য দ্বারা তাদের মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া; দ্বিতীয়, যুলায়খার ঘটনা। এতেও ইউসূফ (আঃ)-এর জামাটিই সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। তৃতীয়, ইয়াকুব (আঃ)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার ঘটনা। এতেও তাঁর জামাটিই মুজ্জবায় প্রতীক প্রমাণিত হয়েছে।

ঘটনাচক্রে একটি কাফেলা এ স্থানে এসে যায়। তফসীরে-কুরতুবীতে বলা হয়েছে : এ কাফেলা সিরিয়া থেকে মিসর যাচ্ছিল। পথ ভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। তারা পানি সঞ্চারকারীদের কূপ প্রেরণ করল।

মিসরীয় কাফেলার পথ ভুলে এখানে পৌঁছা এবং এই অন্ধ কূপে সম্পূর্ণ হওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু যারা সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে সত্যক জ্ঞাত, তারা জানে যে, এসব ঘটনা একটি পরস্পর সংযুক্ত ও অটুট ব্যবস্থাপনার মিলিত অংশ। ইউসূফের স্ত্রী ও রক্ষকই কাফেলাকে পথ থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন এক কাফেলার লোকদেরকে এই অন্ধ কূপে প্রেরণ করেছেন। সাধারণ মানুষ যেসব ঘটনাকে আকস্মিক - ব্যাপারবাহীন মনে করে, সেগুলোর অবশ্যই তদ্রূপ। দার্শনিকরা এগুলোকে দৈববাহীন ঘটনা আখ্যা দিয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এটা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টজগতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অজ্ঞতার

কিনয়ক। নতুবা সৃষ্টিপরাঙ্গরায় দৈবাৎ কোন কিছু হয় না। আল্লাহ্  
আলার অবস্থা হচ্ছে **فَكَالَ لَيْلًا يُرِي** (তিনি যা ইচ্ছা, তাই করেন।) তিনি  
কোন রহস্যের অধীনে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যে, বাহ্যিক  
কালীর সাথে তার কোন সম্পর্ক বোঝা যায় না। মানুষ একেই দৈব  
মানে করে বসে।

একটি কথা, কাফেলার মালেক ইবনে দো'বর নামে জনৈক ব্যক্তি  
কবিতা কবিতা আছে, তিনি এই কূপে পৌছলেন এবং বালতি নিক্ষেপ  
করলেন। ইউসুফ (আঃ) সর্বশক্তিমানের সাহায্য প্রত্যক্ষ করে বালতির  
শক্তি করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি সমুচ্ছল  
কুমুদে দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। এ মুখমণ্ডলের ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য থেকে দৃষ্টি  
কিয়ে নিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রেও অনুপম সৌন্দর্য ও গুণ-গত উৎকর্ষের  
স্বাক্ষরিত তার মহত্বের কম পরিচায়ক ছিল না। সম্পূর্ণ  
অজ্ঞানভাবে কূপের তলদেশ থেকে ভেসে উঠা এই অস্পবয়স্ক,  
কাল্পণ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে মালেক সোদাসে চীৎকার করে  
উঠল : **يٰٓسُفْيٰنُ هٰذَا غٰمِرٌ** - আরে, আনন্দের কথা- এ তো বড় চমৎকার

এক কিশোর বের হয়ে এসেছে। সহীহ মুসলিমের মি'রাজ রজ্জীর হাদীসে  
মুসল্লাহ (সাঃ) বলেন : আমি ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের পর  
বিলকাম যে, আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র বিশ্বে রূপ-সৌন্দর্যের অর্থে তাঁকে  
দাঁ করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্থে সমগ্র বিশ্বে কবিতা করা হয়েছে।

**وَاسْرُوْهُ بِصٰمَةِ** - অর্থাৎ, তারা তাঁকে একটি পণ্যদ্রব্য মনে করে  
পোশন করে ফেলল। উদ্দেশ্য এই যে, শুরুতে তো মালেক ইবনে দো'বর  
কিশোরকে দেখে অবাক বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল; কিন্তু পরে  
চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করল যে, এটা জানাজানি না হওয়া উচিত এবং  
পোশন করে ফেলা দরকার, যাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ লাভ করা  
যায়। সমগ্র কাফেলার মধ্যে এ বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে সবাই এতে  
অশীদার হয়ে যাবে।

এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা বাস্তব ঘটনা  
পোশন করে তাকে পণ্যদ্রব্য করে নিল, যেমন কোন কোন রেওয়াজে  
আছে যে, ইয়াহুদা প্রত্যহ ইউসুফ (আঃ)-কে কূপের মধ্যে খানা  
পৌছানোর জন্যে যেতো। তৃতীয় দিন তাকে কূপের মধ্যে না পেয়ে সে  
কিরে এসে ভাইদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করল : অতঃপর সব ভাই একত্রে  
সেখানে পৌছল এবং অনেক বোজাখুঁজির পর কাফেলার লোকদের কাছ  
থেকে ইউসুফকে বের করল। তখন তারা বলল : এই ছেলেটি আমাদের  
গোলাম। পলায়ন করে এখানে এসেছে। তোমরা একে কন্ডায় নিয়ে খুব  
খরাপ কাজ করবে। একথা শুনে মালেক ইবনে দো'বর ও তার সঙ্গীরা  
ভীত হয়ে গেল যে, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হবে। তাই ভাইদের  
সাথে তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগল।

এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফ ভ্রাতারা নিজেরাই  
ইউসুফকে পণ্যদ্রব্য স্থির করে বিক্রি করে দিল।

**وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ** - অর্থাৎ তাদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ্  
জ্ঞাতার জানা ছিল।

উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা কি করবে এবং তাদের কাছ থেকে  
ক্রেতা কাফেলা কি করবে— সব আল্লাহ্ তাআলার জানা ছিল। তিনি  
তাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়ারও শক্তি রাখতেন। কিন্তু বিশেষ

কোন রহস্যের কারণেই আল্লাহ্ তাআলা এসব পরিকল্পনাকে ব্যর্থ  
করেননি; বরং নিজস্ব পথে চলতে দিয়েছেন।

**وَسَوْرُوْهُ يُخْبِرُوْنَكَ رَازِقَهُمْ عَلٰۤى سُوْرُوْهُ** - আরবী ভাষায় **شراء** শব্দ ক্রয়  
করা ও বিক্রয় করা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলেও উভয় অর্থের  
সম্ভাবনা রয়েছে। যদি সর্বনামকে ইউসুফ ভ্রাতাদের দিকে ফেরানো হয়,  
তবে বিক্রয় করার অর্থ হবে এবং কাফেলার লোকদের দিকে ফেরানো হলে  
ক্রয় করার অর্থ হবে। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা বিক্রয় করে দিল  
কিংবা কাফেলার লোকেরা ইউসুফকে খুব সস্তা মূল্যে অর্থাৎ নামে মাত্র  
কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল।

কুরতুবী বলেন : আরব বণিকদের অভ্যাস ছিল, তারা মোটা অঙ্কের  
লেন-দেন পরিমাপের মাধ্যমে করত এবং চল্লিশের উর্ধ্বে নয়, এমন  
লেন-দেন গণনার মাধ্যমে করত। তাই **دَرَاهِمٌ** শব্দের সাথে **مُدَّوْدَةٌ**  
(গুণগুণতি) শব্দের প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় যে, দিরহামের পরিমাণ  
চল্লিশের কম ছিল। ইবনে কাসীর আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়াজে  
লেখেন : বিশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছিল এবং দশ  
ভাই দুই দিরহাম করে নিজেদের মধ্যে তা কটন করে নিয়েছিল।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রাথমিক জীবন-বৃত্তান্ত  
বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, কাফেলার লোকেরা যখন তাঁকে কূপ থেকে উদ্ধার  
করল, তখন ভ্রাতারা তাঁকে নিজেদের পলাতক ক্রীতদাস আখ্যা দিয়ে  
শুটিকতক দিরহামের বিনিময়ে তাঁকে বিক্রি করে দিল। প্রথমতঃ এ কারণে  
যে, তারা এ মহাপুরুষের সঠিক মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। দ্বিতীয়তঃ  
তাদের আসল লক্ষ্য তাঁর দ্বারা টাকা-পয়সা উপার্জন করা ছিল না; বরং  
পিতার কাছ থেকে তাঁকে বিক্রি করে দেয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। তাই শুধু  
বিক্রি করে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা আশঙ্কা করছিল যে,  
কাফেলার লোকেরা তাকে এখানেই ছেড়ে যাবে এবং অতঃপর সে কোন  
রকমে পিতার কাছে পৌছে আগাগোড়া চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে। তাই  
তফসীরবিদ মুজাহিদের বর্ণনা অনুযায়ী, তারা কাফেলা রওয়ানা হয়ে  
যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল। যখন কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল,  
তখন তারা কিছুদূর পর্যন্ত কাফেলার পেছনে পেছনে গেল এবং তাদেরকে  
বলল : দেখ, এর পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। একে মুক্ত ছেড়ে দিয়ো না;  
বরং বেঁধে রাখ। এ অমূল্য নিধির মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ কাফেলার  
লোকেরা তাঁকে এমনিভাবে মিসরে নিয়ে গেল — (ইবনে-কাসীর)

এর পরবর্তী ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত রয়েছে। কোরআনের  
নিজস্ব সংক্ষিপ্তকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী কাহিনীর যতটুকু অংশ  
আপনা-আপনি বোঝা যায়, তার বেশী উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করা  
হয়নি; উদাহরণতঃ কাফেলার বিভিন্ন মনখিল অতিক্রম করে মিসর পর্যন্ত  
পৌছা, সেখানে পৌছে ইউসুফ (আঃ)-কে বিক্রি করে দেয়া ইত্যাদি।  
এগুলো ছেড়ে দিয়ে অতঃপর বলা হয়েছে :

**وَقَالَ اِنِّىۡ اَسْرٰٓءُ مِنْ مِّمْرٰٓنَ وَمَعٰٓرِ لٰمٍ اَوْ اَمْرٰٓءٍ مِّمَّوْنَةٍ** - অর্থাৎ যে  
ব্যক্তি ইউসুফ (আঃ)-কে মিসরে ক্রয় করল, সে তার স্বীকৃতি বলল :  
ইউসুফের বসবাসের সুবন্দোবস্ত কর।

তফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে : কাফেলার লোকেরা তাঁকে মিসর  
নিয়ে যাওয়ার পর বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করতইই ক্রেতার  
প্রতিযোগিতামূলকভাবে দাম বলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ইউসুফ (আঃ)-  
এর ওজনের সমান স্বর্ণ, সমপরিমাণ মৃগাভি এবং সমপরিমাণ রেশমী

বস্ত্র দাম সাব্যস্ত হয়ে গেল।

আল্লাহ তাআলা এ রত্ন আখীয়ে মিসরের জন্যে অবধারিত করেছিলেন। তিনি বিনিময়ে উল্লেখিত দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ইউসুফ (আঃ)-কে ক্রয় করে নিলেন।

কোরআনের পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে জানা গেছে যে, এগুলো কোন দেবাত্মক ঘটনা নয়; বরং বিশু পালকের রচিত অটুট ব্যবস্থাপনার অংশমাত্র। তিনি মিসরে ইউসুফ (আঃ)-কে ক্রয় করার জন্যে এ দেশের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। ইবনে-কাসীর বলেন : যে ব্যক্তি ইউসুফ (আঃ)-কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিসরের অর্থমন্ত্রী। তাঁর নাম কিতফীর কিংবা ইতফীর বলা হয়ে থাকে। তখন মিসরের সম্রাট ছিলেন আমালেকা জাতির জনৈক ব্যক্তি রাইয়ান ইবনে ওসায়দ। তিনি পরবর্তীকালে ইউসুফ (আঃ)-এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁরই জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।—(মাঘহারী) ক্রেতা আখীয়ে মিসরের স্ত্রীর নাম ছিল রাইল কিংবা যুলায়খা। আখীয়ে-মিসর 'কিতফীর' ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন : তাকে বসবাসের উত্তম জায়গা দাও-ক্রীতদাসের মত রেখো না এবং তার প্রয়োজনাদির সুবন্দোবস্ত কর।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং চেহারা দেখে শুভাশুভ নিরূপণকারী প্রমাণিত হয়েছেন। প্রথম, আখীয়ে-মিসর। তিনি স্বীয় নিরূপণ শক্তি দ্বারা ইউসুফ (আঃ)-এর গুণাবলী অবহিত হয়ে স্ত্রীকে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়, হযরত শোআয়েব (আঃ)-এর ঐ কন্যা, যে মুসা (আঃ) সম্পর্কে পিতাকে বলেছিল :  
يَا بَيْتَ اسْتَأْذِنُكَ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْذِنْتَ الْقَوْمَ  
পিতাঃ, 'তাকে চাকর রেখে দিন। কেননা, উত্তম চাকর ঐ ব্যক্তি, যে সকল, সূঠাম ও বিশুদ্ধ হয়।' তৃতীয় হযরত আবুবকর সিদ্দীক, যিনি ফারাকে আযম (রাঃ)-কে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছিলেন।—(ইবনে কাসীর)

وَكَذَلِكَ نَتُوبُكَ فِي الْأَرْضِ — অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম। এতে ভবিষ্যৎ ঘটনার সুসংবাদ রয়েছে যে, যে ইউসুফ এখন ক্রীতদাসের বেশে আখীয়ে মিসরের গৃহে প্রবেশ করেছে, অতি সম্ভব সে মিসরের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবে।

وَلَعَلَّكُمْ مِّنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ — এখানে শুরুতে ওর কে عطف এর

অর্থে নিলে এ অর্থেই একটি বাক্য উহা মেনে নেয়া হবে। অর্থাৎ, আমি ইউসুফ (আঃ)-কে রাজত্ব দান করেছি, যাতে সে পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচারের মাধ্যমে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে, এ দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে এবং তাকে আমি বাক্যাদির পরিপূর্ণতা অনুশবানের পদ্ধতি শিক্ষা দেই। উপরোক্ত কথাটি ব্যাপক অর্থবহ। জীব যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা, যাবতীয় জরুরী জ্ঞান অর্জিত হওয়া, স্বপ্নের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَاللَّهُ عَالِمُ غَيْبَاتِهِ — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা স্বীয় কর্মে প্রকল

শক্তিমান। যাবতীয় বাহ্যিক কারণ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সঞ্চারিত হয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যখন আল্লাহ তাআলা কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার সব উপকরণ তাঁর জন্যে প্রস্তুত করে দেন।

وَلَكِنَّ الْكُفْرَانَ لِرَبِّكَمْ يَوْمَئِذٍ — কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য বুঝে

না। তারা বাহ্যিক উপকরণাদিকেই সবকিছু মনে করে এগুলোর তিচ্ছন্ন ব্যাপ্ত থাকে এবং উপকরণ সৃষ্টিকারী ও সর্বশক্তিমানের কথা ভুলে যায়।

وَلِكِتَابِكَ أَشْهَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَلِيمًا — অর্থাৎ, যখন ইউসুফ (আঃ)

পূর্ণ শক্তি ও যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও কুশলি দান করলাম।

'শক্তি ও যৌবন, কোন্ বয়সে অর্জিত হল, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস, মুজাযিহ, কাতাদাহ (রাঃ) বলেন : তখন বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। যাহ্যাক বিশ বছর এবং হাসান বসরী চতুর্দশ বছর বর্ণনা করেছেন। তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করার অর্থ এস্থলে নবুওয়ত দান করা। এতে আরও জানা গেল যে, ইউসুফ (আঃ) মিসর পৌছারও অনেক পরে নবুওয়ত লাভ করেছিলেন। কুপের গভীরে যে গুহী তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, তা নবুওয়তের গুহী ছিল না; বরং আভিধানিক 'গুহী' ছিল, যা পয়গম্বুর নয়-এমন ব্যক্তির কাছেও প্রেরণ করা যায়; যেমন মুসা (আঃ)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা মরিয়ম সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে।

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُتَّقِينَ — আমি সৎকর্মশীলদেরকে এমনিভাবে

প্রতিদান দিয়ে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ধর্মসেৱকবল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও সম্মান পর্যন্ত পৌছানো ছিল ইউসুফ (আঃ)-এর সর্বাঙ্গ, আল্লাহ জীতি ও সৎকর্মের পরিণতি। এটা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য নয়, যে কেউ এমন সৎকর্ম করবে, সে এমনিভাবে আমার পুরস্কার লাভ করবে।



আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَرَأَوْنَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ وَعَقَّبْتِ الْأَوْبَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ

অর্থঃ, যে মহিলার গৃহে ইউসুফ (আঃ) থাকতেন, সে তাঁর প্রকৃতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং তাঁর সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে তাঁকে ফুসলাতে লাগল। সে গৃহের সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে বলল : শীঘ্র এসে যাও, তোমাকেই বলছি।

প্রথম আয়াতে জানা গিয়েছিল যে, এ মহিলা ছিল আশীযে-মিসরের স্ত্রী। কিন্তু এ স্থলে কোরআন ‘আশীয-পত্নী’ এই সংকীর্ণ শব্দ ছেড়ে ‘যার গৃহে সে ছিল’ এ শব্দ ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ)–এর গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এ কারণে আরও অধিক কঠিন ছিল যে, তিনি তারই গৃহে-তারই আশ্রয়ে থাকতেন। তার আদেশ উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

গোনাহ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন স্বয়ং আত্মাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা : এর বাহ্যিক কারণ ঘটে এই যে, ইউসুফ (আঃ) যখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন পয়গম্বরসুলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথম আত্মাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। قَالَ مَتَىٰ آتَانِيهِ তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের উপর ভরসা করেননি। এটা জানা কথা যে, যে ব্যক্তি আত্মাহর আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ বিশুদ্ধ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। অতঃপর তিনি পয়গম্বরসুলভ বিজ্ঞতা ও উপদেশ প্রয়োগ করে স্বয়ং যুলায়খাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারও উচিত আত্মাহকে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা থেকে বিরত থাকা। তিনি বললেন :

إِنَّهُ رَبِّيَ أَحْسَنُ مَرْثِيًّا إِنَّهُ لَا يُظْلِمُ الظَّالِمِينَ

তিনি আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে সুখে রেখেছেন। মনে রেখো, অত্যাচারীরা কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমার স্বামী আশীযে-মিসর আমাকে লালন-পালন করেছেন, আমাকে উত্তম জায়গা দিয়েছেন। অতএব তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী। আমি তাঁর ইয়্যতে হস্তক্ষেপ করব? এটা জ্বযনা অনাচার, অথচ অনাচারীরা কখনও কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না। এভাবে তিনি যেন স্বয়ং যুলায়খাকেও এ শিক্ষা দিলেন যে, আমি কয়েকদিন লালন-পালনের কৃতজ্ঞতা যখন এতটুকু স্বীকার করি, তখন তোমাকে আরও বেশী স্বীকার করা দরকার।

এখানে ইউসুফ (আঃ) আশীযে-মিসরকে স্বীয় ‘রব’ – পালন কর্তা বলেছেন। অথচ এ শব্দটি আত্মাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বেধ নয়। কারণ, এ ধরনের শব্দ শেরকের ধারণা সৃষ্টিকারী এবং মুশরেকদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে, কোন দাস স্বীয় প্রভুকে ‘রব’ বলতে পারবে না এবং কোন প্রভু স্বীয় দাসকে ‘বন্দা’ বলতে পারবে না। কিন্তু এ হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য। এতে শেরক নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে এমন বিষয়বস্তুকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা শেরকের উপায় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে শেরককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও কারণ এবং উপায়াদির উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। এ কারণে পূর্ববর্তী

وَرَأَوْنَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ وَعَقَّبْتِ الْأَوْبَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ  
 إِنَّهُ لَا يُظْلِمُ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ  
 رَبَّهَا نَأَىٰ رَبُّهَا كَذَلِكَ لَفِئَتِ بِهَا الشَّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ ۝  
 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ  
 قَيْمِصَةُ مِنْ دُبُرِهِ أَلْفَا سَيْدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا حَزَنُنِي  
 مِنْ أَرَادِيَ بِأَهْلِكَ سُوءَ إِلَّا أَنْ يُسْجِنَ أَوْ عَذَابَ الْإِلْمِ ۝  
 قَالَ هِيَ رَأَوْسِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا  
 إِنْ كَانَ قَيْمِصَةُ قَدْ مِمَّنْ قَبْلِ صَدَقَاتِ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ  
 وَإِنْ كَانَ قَيْمِصَةُ قَدْ مِمَّنْ دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ  
 الصَّادِقِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهُمُصَّةً قَدْ مِمَّنْ دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ  
 كِبْدِكُنِ إِنَّكَ كِيدَكُنِ عَظِيمٌ ۝ يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا  
 وَاسْتَعْفَرَ لِي لِنِكَتِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝ وَقَالَ  
 فِسْوَةٌ فِي الْبَلَدِ إِنَّ أُمَّرَأَتَا الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهُمَا عَن  
 نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

(২৩) আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বলল : ওশু। তোমাকে বলছি, দ্রুত আস। সে বলল : আত্মাহ রক্ষা করুন, তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে সহজে থাকতে দিয়েছেন। নিচয় সীমা দাঁকনকারীগণ সফল হয় না। (২৪) নিচয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। এমনভাবে হয়েছে, যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিচয় সে আমার মনোনীত বাল্যদের একজন। (২৫) তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল : যে ব্যক্তি তোমার পরিচয়নের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে ? (২৬) ইউসুফ (আঃ) বললেন : সে-ই আমাকে আত্মসংরক্ষণ না করতে ফুসলায়েছে। মহিলার পরিবারের জনকে সাক্ষী দিল যে, যদি তার জামা নামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদি। (২৭) এবং যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী (২৮) অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন, তখন সে বলল : নিচয় এটা আমাদের হলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের হলনা খুবই যারাজ্বক। (২৯) ইউসুফ এ প্রসঙ্গ ছাড়। আর হে নারী! এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তুমি-ই পাপাচারিনী। (৩০) নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আশীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্যে বাস্তিতে দেখতে পাচ্ছি।

শরীয়তসমূহে চিত্র নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে বিধায় একে শেরক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত রাখার কারণে শিরেকের উপায়াদি তথা চিত্র ও শেরকের ধারণা সৃষ্টিকারী শব্দাবলীও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, ইউসুফ (আঃ) এর **تَوَكَّلْ**, 'তিনি আমার পালনকর্তা' বলা স্বস্থানে ঠিকই ছিল।

পক্ষান্তরে **الْحَمْدُ** শব্দের সর্বনামটি আল্লাহর দিকে ফেরানোও সম্ভবপর। অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহকেই 'রব' বলেছেন। বসবাসের উত্তম জায়গাও প্রকৃতপক্ষে তিনিই দিয়েছেন। সেমতে তাঁর অবাধ্যতা সর্ববৃহৎ জুমুম। এরাপ জুমুমকারী কখনও সফল হয় না।

সুদী ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ নির্জনতায় যুলায়খা ইউসুফ (আঃ)—কে আকৃষ্ট করার জন্যে তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল। সে বলল : তোমার মাথার চুল কত সুন্দর ! ইউসুফ (আঃ) বললেন : মৃত্যুর পর এই চুল সর্বপ্রথম আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর যুলায়খা বলল : তোমার নেত্রদ্বয় কতই না মনোরম ! ইউসুফ (আঃ) বললেন : মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। যুলায়খা আরও বলল : তোমার মুখমণ্ডল কতই না কমনীয় ! ইউসুফ (আঃ) বললেন : এগুলো সব মৃত্তিকার খোরাক। আল্লাহ তাআলা তাঁর মনে পরকালের চিন্তা এতে বেশী প্রবল করে দেন যে, ভরা যৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোগ-বিলাস তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। সত্য বলতে কি পরকালের চিন্তাই মানুষকে সর্বত্র সব অনিষ্ট থেকে নির্লিপ্ত রাখতে পারে।

পূর্ববর্তী আয়াতে ইউসুফ (আঃ)—এর বিরাট পরীক্ষা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, আযীযে-মিসরের স্ত্রী যুলায়খা গৃহের দরজা বন্ধ করে তাকে পাপকাজের দিকে আহ্বান করতে সচেষ্ট হল এবং নিজেই প্রতি আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত করার সব উপকরণ উপস্থিত করে দিল, কিন্তু ইচ্ছতের মালিক আল্লাহ এ সব যুবককে এহেন অগ্নিপরীক্ষায় দৃঢ়পদ রাখলেন। এর আরও বিবরণ আয়াত্যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে হল এবং মিলেও মানবিক স্বভাববশতঃ কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত বোকা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঠিক সেই মুহূর্তে স্বীয় যুক্তি প্রমাণ ইউসুফ (আঃ)—এর সামনে তুলে ধরেন, যদ্বরন সেই অনিচ্ছাকৃত বোকা ক্রমবর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেতে লাগলেন।

এ আয়াতে **م** শব্দটি (কল্পনা অর্থে) যুলায়খা ও ইউসুফ (আঃ)—উভয়ের প্রতি সম্মুখকৃত করা হয়েছে। বলা হয়েছে : **وَلَقَدْ هَمَّتْ وَهِيَ وَهْمًا** একথা সূনিশ্চিত যে, যুলায়খার কল্পনা ছিল পাপকাজের কল্পনা। এতে ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কেও এ ধরনের ধারণা হতে পারত। অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী এটা নবুওয়ত ও রেসালতের পরিপন্থী। কেননা, সকল মুসলিম মনীষীই এ বিষয়ে একমত যে, পয়গম্বরগণ সর্বপ্রকার সঙ্গীরা ও কবীরা গোনাহ থেকে পবিত্র থাকেন। তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহ ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা ভুলবশতঃ কোনরূপেই হতে পারে না। তবে সঙ্গীরা গোনাহ অনিচ্ছা ও ভুলবশতঃ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাঁদেরকে এর উপরও সক্রিয় থাকতে দেয়া হয় না; বরং সতর্ক করে তা থেকে সরিয়ে আনা হয়।

পয়গম্বরগণের পবিত্রতার এ বিষয়টি কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত

হওয়া ছাড়াও তাঁদের যোগ্যতার প্রশ্নেও জরুরী। কেননা, যদি পয়গম্বরগণের দ্বারা গোনাহ স্বেচ্ছিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাঁদের অনীত ধর্ম ও গুহীর প্রতি আস্থার কোন উপায় থাকে না এবং তাঁদেরকে প্রেরণ ও তাঁদের প্রতি গ্রহণ অবতারগণের কোন উপকারিতাও অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক পয়গম্বরকেই গোনাহ থেকে পবিত্র রেখেছেন।

সহীহ বুখারীর হাদীসে আছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের এমন পাপচিন্তা ও কল্পনা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা সে কার্যে পরিণত করে না। (কুরতুবী)

বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলেন : আমার বন্দা যখন কোন সংকাজের ইচ্ছা করে, তখন শুধু ইচ্ছা কারণে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও। যদি সে সংকাজটি সম্পন্ন করে, তবে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি কোন পাপকাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও এবং যদি পাপকাজটি করেই ফেলে তবে একটি গোনাহই লিপিবদ্ধ কর। (ইবনে-কাসীর)

মোটকথা এই যে, ইউসুফ (আঃ)—এর অন্তরে যে কল্পনা অর্থ বোকা সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। ঐ গোনাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর এ ধারণার বিপক্ষে কাজ করার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর মর্যাদা আরও বেড়ে গেছে।

**لَوْلَا اَنْ رَّا سَيِّئَاتِهَا** অশ্লিষ্ট পাপে উল্লেখ করা হলেও তা আল্লাহ

অশ্রী রয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, ইউসুফ (আঃ)—এর মনে কল্পনা সৃষ্টি হত, যদি তিনি আল্লাহর প্রমাণ অবলোকন না করতেন। কিন্তু পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করার কারণে তিনি এ কল্পনা থেকে ঠেঁকে গেলেন। এ বিষয়বস্তুটি সঠিক, কিন্তু কোন কোন তফসীরবিদ এ অগ্র-পশ্চাৎকে ব্যাকরণিক ভুল আখ্যা দিয়েছেন। এদিক দিয়েও প্রমাণ তফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ, এতে ইউসুফ (আঃ)—এর আল্লাহ ভীতি ও পবিত্রতার মাহাত্ম্য আরও উচ্চে চলে যায়। কেননা, তিনি স্বাভাবিক ও মানবিক বোকা সত্ত্বেও গোনাহ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন।

**لَوْلَا اَنْ رَّا سَيِّئَاتِهَا** এখানে এর **جزا** উহা রয়েছে। অর্থ এই যে,

যদি তিনি পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন না করতেন, তবে এ কল্পনারই লিপ্ত থাকতেন। পালনকর্তার প্রমাণ দেখে নেয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও ধারণা অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল।

স্বীয় পালনকর্তার যে প্রমাণ ইউসুফ (আঃ)—এর দৃষ্টির সামনে এসেছিল, তা কি ছিল কোরআন পাক তা ব্যক্ত করেনি। এ কারণেই এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণ নানা মত ব্যক্ত করেছেন। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, হাদ্দ বসরী (রহঃ) প্রমুখ বলেছেন : আল্লাহ তাআলা যু'জ্জযা হিসেবে এ নির্দোষ কক্ষে হয়রত ইয়াকুব (আঃ)—এর চিত্র এভাবে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করে দেন যে, তিনি হাতের অঙ্গুলি দাঁতে চেপে তাঁকে হুশিয়ার করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : আযীযে-মিসরের মুখচ্ছবি তাঁর সম্মুখে হুশিয়ার তোলা হয়। কেউ বলেন : ইউসুফ (আঃ)—এর দৃষ্টি ছাদের দিকে উর্ধ্ব দিকে সেখানে কোরআন পাকের এ আয়াত লিখিত দেখলেন :

وَلَا تُقْرَبُوا الرِّبِّيَّ إِنَّهُ كَانَ رِئَاسَةً وَمُسْتَكْبِرًا — অর্থাৎ,

স্বীকারের নিকটবর্তী হওয়া না। কেননা, এটা খুবই নির্লজ্জতা, (খোদায়ী সন্তানের কারণ) এবং (সমাজের জন্যে) অত্যন্ত মন্দ পথ। কেউ কেউ বলেন : যুলায়খার গৃহে একটি মূর্তি ছিল। সে বিশেষ মুহূর্তটিতে যুলায়খা সেই মূর্তিটি কাপড় দ্বারা আবৃত করলে। ইউসূফ (আঃ)—এর কারণ বিজ্ঞাস করলেন। সে বলল : এটা আমার উপাস্য। এর সামনে গোনাহ্ মন্দির মত সাহস আমার নেই। ইউসূফ (আঃ) বললেন : আমার উপাস্য কিংবা বেশী লজ্জা করার যোগ্যতাসম্পন্ন। তাঁর দৃষ্টিকে কোন পর্দা দ্বারাও ঢেকে রাখা যায় না। কারণ ও কারণ মতে ইউসূফ (আঃ)—এর নবুওয়ত ও নিব্ব্বানই ছিল স্বয়ং পালনকর্তা সম্পর্কে তাঁর এই দিব্যদৃষ্টির কারণ।

তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুখীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন : কোরআন-পাক যতটুকু বিষয় বর্ণনা করেছে, ততটুকু নিয়েই ক্রান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ, ইউসূফ (আঃ) এমন কিছু দেখেছেন, কল্পনা তাঁর মন থেকে সীমালংঘন করার সামান্য ধারণাও বিদূরিত হয়ে গেছে। এ বস্তুটি কি ছিল — তফসীরবিদগণ যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর যে কোন একটি হতে পারে; তাই নিশ্চিতরূপে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করা যায় না।—(ইবনে কাসীর)

كَذَلِكَ نَصُورَتِ عَنَّا الشُّورُ وَالْفُحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ الْمُتَكَبِّرِينَ

অর্থাৎ, আমি ইউসূফ (আঃ)—কে এ প্রমাণ এজন্যে দেখিয়েছি, যাতে জর কাছ থেকে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে দূরে সরিয়ে দেই। ‘মন্দ কাজ’ বল সঙ্গীরা গোনাহ্ এবং ‘নির্লজ্জতা’ বলে কবীরা গোনাহ্ বোঝানো হয়েছে।—(মাহহারী)

এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে ইউসূফ (আঃ)—এর কাছ থেকে সরানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইউসূফ (আঃ)—কে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতা থেকে সরানোর কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসূফ (আঃ) নবুওয়তের কারণে এ গোনাহ্ থেকে নিজেই দূরে ছিলেন, কিন্তু মন্দ কাজ নির্লজ্জতা তাঁকে ছাড়াই সরানোর উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আমি এর জাল ছিন্ন করে দিয়েছি। কোরআন পাকের এ ভাষাও সাক্ষ্য দেয় যে, ইউসূফ (আঃ) কোন সামান্যতম গোনাহ্ও লিপ্ত হননি এবং তাঁর মনে যে কল্পনা জাগ্রিত হয়েছিল, তা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নতুবা এখানে এভাবে বক্তৃতা করা হত যে, আমি ইউসূফকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে দিলাম—এভাবে বলা হত না যে, গোনাহ্কে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম।

কেননা, ইউসূফ আমার মনোনীত বন্দাদের একজন। এখানে **مخلصين** শব্দটি নামের যবর-যোগ **مخلص** এর বহুবচন। এর অর্থ মনোনীত। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসূফ (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার ঐ সব বন্দার অন্যতম, যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ রেসালতের দায়িত্ব পালন ও মানবজাতির স্বশোধনের জন্যে মনোনীত করেছেন। এমন লোকের চারপাশে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেফাজতের পাহারা থাকে, যাতে তাঁরা কোন মন্দ কাজে লিপ্ত হতে না পারেন। স্বয়ং শয়তানও তার বিবৃতিতে একথা স্বীকার করেছে যে, আল্লাহ্র মনোনীত বন্দাদের উপর তার কলা-কৌশল অচল। শয়তানের উক্তি এই :

আপনার ইয়যত ও শক্তির কসম, আমি সব মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করব, তবে যেসব বন্দাকে আপনি মনোনীত করেছেন,

তাদেরকে ছাড়া।

কোন কোন কেরাআতে এ শব্দটি **مخلصين** নামের যের-যোগেও পঠিত হয়েছে। **مخلص** ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র এবাদত ও আনুগত্য আন্তরিকতার সাথে করে—এতে কোন পার্থিব ও প্রবৃত্তিগত উদ্দেশ্য, সুখ্যাতি ইত্যাদির প্রভাব থাকে না। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তিই স্বীয় কর্ম ও এবাদতে আন্তরিক হয়, পাপ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা তাকে সাহায্য করেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা দু’টি শব্দ **سوء** ও **فحشاء** ব্যবহার করেছেন। প্রথমটির শাব্দিক অর্থ মন্দ কাজ এবং এর দ্বারা সঙ্গীরা গোনাহ্ বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা ইউসূফ (আঃ)—কে সঙ্গীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনাহ্ থেকেই মুক্ত রেখেছেন।

এ থেকে আরও বোঝা গেল যে, কোরআনে ইউসূফ (আঃ)—এর প্রতি যে **م** অর্থাৎ, কল্পনা শব্দটিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল, যা কবীরা ও সঙ্গীরা কোন প্রকারের গোনাহ্‌রই অন্তর্ভুক্ত নয়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে যে, আযীযে-মিসরের পত্নী যখন ইউসূফ (আঃ)—কে পাপে লিপ্ত করার চেষ্টায় ব্যাপ্তা ছিল এবং ইউসূফ (আঃ) তা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মনে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বিধা-দ্বন্দ্বও ছিল, তখন আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় মনোনীত পয়গম্বরের সাহায্যার্থে অলৌকিকভাবে কোন এমন বস্তু তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করে দেন, যার ফলে সে অনিচ্ছাকৃত কল্পনাও তাঁর মন থেকে উধাও হয়ে যায়। সে বস্তুটি পিতা ইয়াকুব (আঃ)—এর আকৃতিই হোক কিংবা ওহীর কোন আয়াত।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইউসূফ (আঃ) এক নির্জন কক্ষে খোদায়ী প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই সেখান থেকে পলায়নোদ্যত হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার জন্যে দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আযীয-পত্নী তাঁকে ধরার জন্যে পেছনে দৌড় দিল এবং তাঁর জামা ধরে তাঁকে বহির্গমনে বাধা দিতে চাইল। তিনি পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প, তাই ধামলেন না। ফলে জামা পেছন দিক থেকে ছিড়ে গেল। ইত্যবসরে ইউসূফ (আঃ) দরজার বাইরে চলে গেলেন এবং তাঁর পশ্চাতে যুলায়খাও তথায় উপস্থিত হল। ঐতিহাসিকসমূহে বর্ণিত আছে যে, দরজা তালাবদ্ধ ছিল। ইউসূফ (আঃ) দৌড়ে দরজায় পৌঁছেতেই আপনা-আপনি তালা খুলে নীচে পাড়ে গেল।

উভয়ে দরজার বাইরে এসে আযীযে-মিসরকে সামনেই দন্ডায়মান দেখতে পেল। তার পত্নী চমকে উঠল এবং কণ্ঠে বানিয়ে ইউসূফ (আঃ)—এর উপর দোষ ও অপবাদ চাপানোর জন্যে বলল : যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এ ছাড়া কি হতে পারে যে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে অথবা অন্য কোন কঠোর দৈহিক নির্যাতন।

ইউসূফ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ ভদ্রতার খাতিরে সম্ভবতঃ সেই মহিলায় গোপন অভিসন্ধির তথ্য প্রকাশ করতেন না, কিন্তু যখন সে নিজেই এগিয়ে এসে ইউসূফ (আঃ)—এর প্রতি অপবাদ আরোপের ইস্তিহাস করল, তখন বাধ্য হয়ে তিনিও সত্য প্রকাশ করে বললেন :

يٰرَاوَدُتْنِي عَنْ نَفْسِي — অর্থাৎ, সে-ই আমার দ্বারা স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্যে ফুসলাচ্ছিল।

ব্যাপার ছিল খুবই নাজুক এবং আযীযে-মিসরের পক্ষে কে সত্যবাদী, তার স্বীকার্য করা সুকঠিন ছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণের কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যেভাবে স্বীয় মনোনীত বন্দাদেরকে গোনাহ থেকে বাচিয়ে নিশ্চাপ ও পবিত্র রাখেন, এমনিভাবে তাঁদেরকে গোনাহ থেকে বাচিয়ে রাখার অলৌকিকভাবে ব্যবস্থাও করে দেন। সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে কথা বলতে অক্ষম-এরূপ কচি শিশুদেরকে কাজে লাগানো হয়েছে। অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাকশক্তি দান করে প্রিয় বন্দাদের পবিত্রতা সপ্রমাণ করা হয়েছে। যেমন হযরত মরিয়মের প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ করতে থাকে, তখন একদিনের কচি শিশু ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা বাকশক্তি দান করে তাঁর মুখে জননীর পবিত্রতা প্রকাশ করে দেন এবং স্বীয় কুদরতের একটি বিশেষ দৃশ্য সবার সামনে প্রকাশ করেন। বনী-ইসরাঈলের একজন সাধু ব্যক্তি জুরাইজের প্রতি গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমনি ধরনের এক অপবাদ আরোপ করা হলে নবজাত শিশু সেই ব্যক্তির পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করে। মুসা (আঃ)-এর প্রতি ফেরাউনের মনে সন্দেহ দেখা দিলে ফেরাউন-পত্নীর কেশ পরিচর্যাকারিণী মহিলার সদ্যজাত শিশু বাকশক্তি প্রাপ্ত হয়। সে মুসা (আঃ)-কে শৈশবে ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করে।

ঠিক এমনিভাবে ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী একটি কচি শিশুকে আল্লাহ তাআলা বিজ্ঞ ও দার্শনিক সুলভ বাকশক্তি দান করলেন। এ কচি শিশু এ গৃহেই দোলনায় লালিত হচ্ছিল। তার সম্পর্কে ধারণা ছিলনা যে, সে এসব কর্মকান্ড দেখবে এবং বুঝবে, অতঃপর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান স্বীয় আনুগত্যের পথে সাধনাকারীদের সঠিক মর্বাদা ফুটিয়ে তোলার জন্যে জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দেন যে, বিশুর প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু তাঁর গুপ্ত বাহিনী। এরা অপরাধীকে ভালভাবেই চেনে, তার অপরাধের রেকর্ড রাখে এবং প্রয়োজন মুহুর্তে তা প্রকাশও করে দেয়। হাশরের ময়দানে হিসাব-কিতাবের সময় মানুষ যখন স্বীয় অপরাধসমূহ স্বীকার করতে অস্বীকার করবে, তখন তারই হস্তপদ, চর্ম ও গৃহপ্রাচীরকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদাতারূপে দাঁড় করানো হবে। তারা তার প্রত্যেকটি কর্মকান্ড হাশরের লোকারণ্যের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেবে। তখন মানুষ বুঝতে পারবে যে, হস্তপদ, গৃহপ্রাচীর ও রক্ষা ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কোনটিই তার আপন ছিল না; বরং এরা সবাই ছিল রাব্বুল আলামীনের গোপন বাহিনী।

মোটকথা এই যে, যে ছোট্ট শিশুটি বাহ্যতঃ জগতের সবকিছু থেকে উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় দোলনায় পড়েছিল, সে ইউসুফ (আঃ)-এর মু'জ্জেবা হিসেবে ঠিক ঐ মুহুর্তে মুখ খুলল, যখন আযীযে-মিশর ছিল এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দিখাদ্দুদে জড়িত।

এ শিশুটি যদি এতটুকুই বলে দিত যে, ইউসুফ (আঃ) নির্দোষ এবং দোষ যুলায়খার, তবে তাও একটি মু'জ্জেবারূপে ইউসুফ (আঃ)-এর পক্ষে তাঁর পবিত্রতার বিরাট সাক্ষ্য হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ শিশুর মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি উচ্চারণ করিয়েছেন যে, ইউসুফ (আঃ)-এর জামাটি দেখে—যদি তা সামনের দিকে ছিঁদ থাকে, যুলায়খার কথা সত্য ইউসুফ (আঃ) মিথ্যাবাদীরূপে সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি জামাটি পেছন দিকে ছিঁদ থাকে, তবে এতে এ ছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই নেই যে, ইউসুফ (আঃ) পলায়রত ছিলেন এবং যুলায়খা তাঁকে পলায়নে বাধা দিতে চাচ্ছিল।

শিশুর বাকশক্তির অলৌকিকতা ছাড়াও এ বিষয়টি প্রত্যেকের

হৃদয়ঙ্গম হতে পারত। অতঃপর যখন বর্ণিত আলামত অনুযায়ী জামাটি পেছন দিকে ছিঁদ দেখা গেল, তখন বাহ্যিক আলামতদ্বয়ে ইউসুফ (আঃ)-এর পবিত্রতা সপ্রমাণ হয়ে গেল।

‘সাক্ষ্যদাতা’র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে, সে ছিল একটি কচি শিশু, যাকে আল্লাহ তাআলা অলৌকিকভাবে বাকশক্তি দান করেন। কে হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে এ ব্যাখ্যা প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে, ইবনে হাব্বান স্বীয় গ্রন্থে এবং হাকিম তাঁর মুত্তাদারকে এটি উল্লেখ করে বর্ণনাটিকে সহীহ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

কতিপয় বিধান ও মাসআলা : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় বিধান ও মাসআলা বোঝা যায় :

মাসআলা : (১) **وَأَسْتَبِقُوا** আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, যে জায়গায় পাশে লিপ্ত হওয়ায় আশঙ্কা থাকে, সে জায়গাকেই পরিজ্ঞান করা উচিত; যেমন ইউসুফ (আঃ) সেখান থেকে পলায়ন করে এর প্রমাণ দিয়েছেন।

মাসআলা : (২) আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী পালনে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার ক্রটি না করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য; যদিও এর ফলাফল বাহ্যিক বের হতে দেখা না যায়। ফলাফল আল্লাহর হাতে। মানুষের কাজ হল স্বীয় শ্রম ও সাধ্যকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে দাসত্বের পরিচয় দেয়; যেমন ইউসুফ (আঃ) সব দরজা বন্ধ হওয়া এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তালাবন্ধ হওয়া সত্ত্বেও দরজার দিকে দৌড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছেন। এহেন অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের আগমন অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা হয়। বন্দা যখন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে কেনে তখন আল্লাহর সাফল্যের উপকরণাদিও সরবরাহ করেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের শেষ দু'আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আযীযে-মিসর শিশুটির এভাবে কথা বলা দ্বারাই বোঝে নিয়েছিলেন যে, ইউসুফ (আঃ)-এর পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যেই এ অস্বাভাবিক ঘটনা অবতারণা হয়েছে। অতঃপর তা বক্তব্য অনুযায়ী যখন দেখল যে, ইউসুফ (আঃ)-এর জামাটিও পেছন দিক থেকেই ছিঁদ, সে তখন নিশ্চিত হয়ে গেল যে, দোষ যুলায়খার এবং ইউসুফ (আঃ) পবিত্র। তদানুসারে যে যুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল : **أَكْذِبُكَ كَذِبًا** অর্থাৎ এসব তোমার ছলনা। তুমি নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও। এরপর বলল : নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। একে বোঝা এবং এর জাল ছিঁদ করা সম্ভব নয়। কেননা, তারা বাহ্যতঃ কোমল, নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে। যার তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। কিন্তু বুদ্ধি ও ধর্মতীকৃতার অভাববশতঃ তা অধিকাংশ সময় ছলনা হয় থাকে।—(মায়হারী)

তফসীর কুরতুবীতে আবু হুরায়রার রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এ উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, নারীদের ছলনা ও চক্রান্ত শয়তানের ছলনা ও চক্রান্তের চাইতে গুরুতর। কেননা, আল্লাহ তাআলা শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে বলেছেন **إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا** “শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল”। পক্ষান্তরে নারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে : **وَكَيْدُ النِّسَاءِ عَظِيمٌ** অর্থাৎ, তোমাদের চক্রান্ত খুবই জটিল। এটা জানা কথা যে, এখার সব নারী বোঝানো হয়নি, বরং এসব নারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা ধরনের ছল-চাতুরীতে লিপ্ত থাকে। আযীযে-মিসর যুলায়খার জ্বল বর্ণ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَبِّرًا  
وَأُتِيَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَبِيئًا وَقَالَتْ ائْخِزْ عَلَيَّ مِنْ ثَمَرِهِ  
رَائِيَةً كَأَيُّوتِهِ وَظَعْنَ آيِدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا  
إِن هَذَا إِلَّا أَمَلٌ كَرِيمٌ ۝ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَ  
لَقَدْ رَأَوْنَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْنَمَهُ وَلَئِن كُنْمُفِعَلٌ مَّا أَمَرُوا  
لَيَسْجُنَنَّ وَلَيْكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ  
إِلَيَّ وَمَا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ إِلَّا لِأَنصُرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْحَابُ  
الْأَيْمُونِ وَأَنْ مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ  
كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ثُمَّ بَدَأَ بِذَاتِ رِجْلَيْهِ  
الرَّيِّبِ لِيَسْجُنَنَّهُ فَحَىٰ حِينٍ ۝ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَبَيَّنَ قَالَ  
أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُجْمَلُ فَوَقَّ  
رَأْسِي خَيْرًا أَتَأْكُلُ الطَّيْرَ مِنِّي بَدِينًا تَبَاؤُهُ لِيَأْكُلَ مِنِّي  
الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَ لَا يَا بُدَّ لَكُمْ آطَاعُوا لَهُ سُرُورًا وَلَا تَبَاؤُنَا  
بِتَأْوِيلِهِ قِيلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا الذُّكْيَانُ مِنَّا عَمَلِكُنِي رَبِّي إِنْ رَكِبْتُ  
مَلَكَةً قَوْمًا لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ قَوْمٌ مُّطْرُونَ ۝

(৩১) যখন সে তাদের চক্রান্ত শুনল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্যে একটি ভোজসভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রতি্যেককে একটি ছুরি দিয়ে বলল : ইউসুফ এদের সামনে তেল এস। যখন তারা তাকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেলল। তারা বলল : কখনই নয়—এ ব্যক্তি মানব নয়। এ তো কোন মহান ফেরেশতা। (৩২) মহিলা বলল : এ ঐ ব্যক্তি, যার জন্যে তোমরা আমাকে ভৎসনা করছিলে। আমি গুরই মন জয় করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজেই নিবৃত্ত রেখেছে। আর আমি যা আদেশ দেই, সে যদি তা না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাজ্বিত হবে। (৩৩) ইউসুফ বলল : হে পালনকর্তা, তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং ভজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৩৪) অতঃপর তার পালনকর্তা তার দোয়া কবুল করে নিলেন। অতঃপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (৩৫) অতঃপর এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাকে কিছুদিন কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করল। (৩৬) তাঁর সাথে কারাগারে মুছন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল : আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিভড়াছি। অপরজন বলল : আমি দেখলাম যে, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখী ঝুকিয়ে যাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলুন। আমরা আপনাকে সংকম্পীল দেখতে পাচ্ছি। (৩৭) তিনি বললেন : আমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দেয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দেব। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি ঐসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা অল্পাধ্বর ধৃতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী।

করার পর ইউসুফ (আঃ)—কে বলল : يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا ۝ অর্থাৎ, ইউসুফ, এ ঘটনাকে উপেক্ষা কর এবং বলাবলি করো—না, যাতে বেইজ্বজতি না হয়। অতঃপর যুলায়খাকে সম্মোখন করে বলল : وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۝ وَاسْتَفْغِرِي لِذَنبِكِ ۝ অর্থাৎ, ভুল তোমারই। তুমি নিজে ভুলের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এতে বাহ্যতঃ বোঝানো হয়েছে যে, স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আঃ)—এর কাছে ক্ষমা চাও। কারণ, নিজে অন্যায় করেছ এবং দোষ তাঁর ঘাড় চাপিয়েছ।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ ۝ অর্থাৎ, যখন যুলায়খা উক্ত মহিলাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারল, তখন তাদেরকে একটি ভোজসভায় ডেকে পাঠাল।

এখানে মহিলাদের কানায়ুখাকে যুলায়খা مَكْرٌ অর্থাৎ, চক্রান্ত বলেছে। অথচ বাহ্যতঃ তারা কোন চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা করত, তাই একে চক্রান্ত বলা হয়েছে।

وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَبِّرًا ۝ অর্থাৎ, তাদের জন্যে তাকিয়াযুক্ত আসন সজ্জিত করল।

وَأُتِيَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَبِيئًا ۝ অর্থাৎ যখন মহিলারা ভোজসভায় উপস্থিত হল, তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করা হল। তন্মধ্যে কিছু খাদ্য চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার ছিল। তাই প্রতি্যেককে এক একটি চাকুও দেয়া হল। এর বাহ্যিক উদ্দেশ্য তো ছিল ফল কাটা ; কিন্তু মনে অন্য ইচ্ছা লুকায়িত ছিল, যা পরে বর্ণিত হবে। অর্থাৎ আগত মহিলারা ইউসুফ (আঃ)—কে দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে এবং চাকু দিয়ে ফলের পরিবর্তে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলবে।

وَقَالَتْ ائْخِزْ عَلَيَّ مِنْ ثَمَرِهِ ۝ অর্থাৎ, এসব আয়োজন সমাপ্ত করার পর অন্য এক কক্ষে অবস্থানরত ইউসুফ (আঃ)—কে যুলায়খা বলল : একটু বের হয়ে এস। ইউসুফ (আঃ) তার কু-উদ্দেশ্য জানতেন না। তাই বাইরে এসে ভোজসভায় উপস্থিত হলেন।

فَكَرَّأَيْتَهُ أَكْرَبْتَهُ وَظَعْنَ آيِدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا  
إِن هَذَا إِلَّا أَمَلٌ كَرِيمٌ

অর্থাৎ, সমাগত মহিলারা ইউসুফ (আঃ)—কে দেখল, তখন তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হয়ে গেল এবং নিজ নিজ হাত কেটে ফেলল। অর্থাৎ ফল কাটার সময় যখন এ বিস্ময়কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হল, তখন চাকু হাতেই লেগে গেল। অন্যমনস্কতার সময় প্রায়ই এরূপ হয়ে থাকে। তারা বলতে লাগল : হায় অল্পাধ্ব, এ ব্যক্তি কখনই মানব নয়। সে তো মহানুভব ফেরেশতা! উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতারাই এরূপ নূরানী চেহারায়ুক্ত হতে পারে।

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَ لَقَدْ رَأَوْنَهُ عَنْ نَفْسِهِ

فَأَسْتَصِمَّ وَإِلَيْكَ تُرْجَعُونَ وَمَا أَلْمَزْنَا ذَا قُرَيْشٍ مِنْ شَيْءٍ فَهُمْ لَا يَتَضَلَّوْنَ وَلَا يَنْبُغُونَ وَلَا يَخَفُ مِنْهُمْ جِئْتَهُم بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكَ وَإِنَّكَ بِرَأْسِ السَّجَّةِ الْكَبِيرَةِ

যুলায়খা বলল : দেখে নাও, এ ঐ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভৎসনা করতে। বাস্তবিকই আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পন করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সে নিশাপ রয়ছে। ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করলে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাক্ষিত হবে।

যুলায়খা যখন দেখল যে, সমাগত মহিলাদের সামনে তার গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সে তাদের সামনেই ইউসুফ (আঃ)-কে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। কোন কোন তফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারা ইউসুফ (আঃ)-কে বলতে লাগল : তুমি যুলায়খার কাছে ঋণী। কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়।

পরবর্তী আয়াতের কোন কোন শব্দ দ্বারাও মহিলাদের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়; যেমন كَيْدَهُنَّ وَعَيْنُكَ وَمَا أَلْمَزْنَا ذَا قُرَيْشٍ مِنْ شَيْءٍ فَهُمْ لَا يَتَضَلَّوْنَ وَلَا يَنْبُغُونَ

ইউসুফ (আঃ) দেখলেন যে, সমবেত মহিলারাও যুলায়খার সূরে সুর মিলিয়েছে এবং তাকে সমর্পন করছে। কাজেই তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার বাহ্যিক কোন উপায় নেই। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে প্রত্যাভর্তন করলেন এবং তাঁর দরবারে আরখ করলেন :

رَبِّ السَّجِينِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَمَا يَدْعُونَ بِهَا لِغِيْبِهِمْ وَلَا أَنْصُرُهُمْ عَلَيْهِمْ كَيْدَهُنَّ أَصْدَبُ إِلَيْنُ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ

অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা! এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করছে, এর চাইতে জেলখানায়ই আমার অধিক পছন্দনীয়। যদি আপনি আমা থেকে ওদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে সম্ভবতঃ আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেলব। 'আমি জেলখানা পছন্দ করি'— ইউসুফ (আঃ)—এর এ উক্তি বন্দীজীবন প্রার্থনা বা কাম্য নয়; বরং পাপকাজের বিপরীতে এই পার্থিব বিপদকে সহজ মনে করার বহিঃপ্রকাশ। কোন কোন রেওয়াজেতে বলা হয়েছে : যখন ইউসুফ (আঃ) জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসল, আপনি নিজেই জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ, আপনি বলেছিলেন رَبِّ السَّجِينِ أَحَبُّ إِلَيَّ

অর্থাৎ, এর চাইতে আমি জেলখানাকে অধিক পছন্দ করি। আপনি নিরাপত্তা চাইলে আপনাকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো। এ থেকে বোঝা গেল যে, কোন বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্যে দোয়ায় 'এর চাইতে অমুক ছোট বিপদে পতিত করা আমি ভাল মনে করি, বলা সমীচীন নয়; বরং প্রত্যেক বিপদাপদের সময় আল্লাহর কাছে নিরাপত্তাই প্রার্থনা করা উচিত। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে সবরের দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, সবরের অর্থ হচ্ছে বিপদাপদে পতিত হওয়ার পর তা সহ্য করার ক্ষমতা। কাজেই আল্লাহর কাছে সবরের দোয়া করার পরিবর্তে নিরাপত্তার দোয়া করা উচিত।—(তিরমিথী)

'যদি আপনি ওদের চক্রান্তকে প্রতিহত না করেন তবে সম্ভবতঃ আমি ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ব'— ইউসুফ (আঃ)—এর একথা বলা নবুওয়তের জন্যে যে পবিত্রতা জরুরী, তার পরিপন্থী নয়। কারণ, এ পবিত্রতার

সারমর্মই হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে গোনাই থেকে বাঁচিয়ে নেবেন। যদিও নবুওয়তের কারণে এ লক্ষ্য পূর্ব থেকেই অর্জিত ছিল, তথাপি শিষ্টাচার প্রসূত চূড়ান্ত ভীতির কারণে এরূপ দোয়া করতে বাধ্য হয়েছেন। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলার সাহায্য ব্যতিরেকে কোনব্যক্তির গোনাই থেকে বাঁচতে পারে না। আরও জানা গেল যে, প্রত্যেক গোনাইর কাজ মুখ্যতাবশতঃ হয়ে থাকে। জ্ঞান মানুষকে গোনাইর কাজ থেকে বিরত রাখে।—(কুরতুবী)

وَإِسْتِجَابَ لَكَ رَبُّكَ فَصَوَّفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থাৎ তাঁর পালনকর্তা দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্তকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রোতা ও জ্ঞানী।

আল্লাহ তাআলা মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফ (আঃ)-কে বাঁচানোর জন্যে একটি ব্যবস্থা করলেন ইউসুফ (আঃ)-এর সফুরিতা, খোদাতীতি ও পবিত্রতার সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী দেখে আযীযে-মিসর ও তার বন্ধুদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ইউসুফ সৎ। কিন্তু শহরময় এ বিষয়ের কানা-ঘুসা হতে থাকে। এ কানা-ঘুসার অবশান করার জন্যে এটাই উত্তম পথ বিবেচিত হল যে, ইউসুফ (আঃ)-কে কিছুদিনের জন্যে জেলে আবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। এ দ্বারা নিজের ঘরও রক্ষা পাবে এক জনগণের মধ্যেও এ বিষয়ের আলোচনা স্তিমিত হয়ে পড়বে।

تُورِدُ الْهُدُودَ بِيَوْمِئَاتٍ فَكَذَلِكَ يُسْجَنُ فِي سِجْنٍ

অর্থাৎ, এর পর আযীয ও তাঁর পারিষদবর্গ কিছু দিনের জন্যে ইউসুফ (আঃ)-কে জেলে আবদ্ধ রাখাটাই মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করলেন এবং সেমত ইউসুফ (আঃ) জেলে প্রেরিত হলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একথা বার বার বলা হয়েছে যে, কোরআন-পাক কোন ঐতিহাসিক ও কিসসা-কাহিনীর গ্রন্থ নয়। এতে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা, উপদেশ ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করা। সমগ্র কোরআন এবং অসংখ্য পয়গম্বরের ঘটনাবলীর মধ্যে একমাত্র ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীটিই কোরআন ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছে। নতুবা স্থানোপযোগী ঐতিহাসিক ঘটনার কোন অত্যাবশ্যকীয় অংশই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীটি আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে এতে শিক্ষা ও উপদেশের অনেক উপাদান এবং মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। প্রাসঙ্গিক এ ঘটনাটিতেও অনেক হেদায়েত নিহিত রয়েছে।

ঘটনা এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর নিশাপ চরিত্র ও পবিত্রতা দিবালোকের মত ফুটে উঠা সত্ত্বেও আযীযে-মিসর ও তার শত্রু লোক-নিন্দা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্যে ইউসুফ (আঃ)-কে কারাগারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা প্রকৃতপক্ষে ইউসুফ (আঃ)-এর দোয়া ও বাসনার বাস্তব রূপায়ন ছিল। কেননা, আযীযে-মিসরের গৃহে গণ্য করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইউসুফ (আঃ) কারাগারে পৌঁছেল সাথে আরও দু'জন অভিজ্ঞ

কয়েদীও কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাহকে মদ্যপান করাৎ এবং অপরাধন বাবুর্চি ছিল। ইবনে-কাসীর তফসীরবিদগণের বরাতে পিরে লিখেছেন : তারা উভয়েই বাদশাহর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। মোকাদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল।

ইউসুফ (আঃ) কারাগারে প্রবেশ করে পয়গম্বরসুলভ চরিত্র, দয়া ও ক্ষমতার কারণে সব কয়েদীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং সাধ্যমত তাদের দেখাশোনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন। কাউকে চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখলে তাকে সাহসনা দিতেন। ধৈর্য শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। নিজে কষ্ট করে জ্বারের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং সারারাত আল্লাহর এবাদতে মগ্ন থাকতেন। তাঁর এহেন অবস্থা দেখে কারাগারের সব কয়েদী তাঁর ভক্ত হয়ে গেল। কারাধ্যক্ষও তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হল এবং বলল : আমার ক্ষমতা থাকলে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। এখানে যাতে আপনার কোনরূপ কষ্ট না হয়, এখন শুধু সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে পারি।

ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে কারাগারে প্রবেশকারী দু'জন কয়েদী একদিন বলল : আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি। তাই আপনার কাছে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই। হযরত ইবনে-আব্বাস ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন : তারা বাস্তবিকই এ স্বপ্ন দেখেছিল। আবদুল্লাহ ইবনে-মাসউদ বলেন : প্রকৃত স্বপ্ন ছিল না। শুধু ইউসুফ (আঃ)-এর মহানুভবতা ও সততা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে স্বপ্ন রচনা করা হয়েছিল।

মোটকথা, তাদের একজন, অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাৎ, সে বলল : আমি স্বপ্নে দেখি যে, আঙ্গুল থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয় জন অর্থাৎ বাবুর্চি বলল : আমি দেখি যে, আমার মাথায় রুটিভর্তি একটি ঝুড়ি রয়েছে। তা থেকে পাখীরা ঠুকরে ঠুকরে আহার করছে। তারা উভয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানাল।

ইউসুফ (আঃ)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে; কিন্তু তিনি পয়গম্বরসুলভ ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তর দানের পূর্বে ঈমানের দাওয়াত ও ধর্মপ্রচারের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। প্রচারের মূলনীতি অনুযায়ী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি মু'জেযা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্যে প্রত্যহ যে খাদ্য তোমাদের বাসা থেকে কিংবা অন্য কোন জায়গা থেকে আসে, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে বলে দেই। বাস্তবে আমার সরবরাহকৃত তথ্য সব সত্য হয়।

ذٰلِكَ اٰیٰتُكَرِّمٰتِنَا اٰرْثًا، এটা কোন ভবিষ্যৎ কথন, জ্যোতিষ বিদ্যা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদের ভেলকি নয়; বরং আমার পালনকর্তা ওহীর

মাধ্যমে আমাকে যা বলে দেন, আমি তাই তোমাদেরকে জানিয়ে দেই। নিঃসন্দেহে এ প্রকাশ্য মু'জেযাটি নবুওয়তের প্রমাণ এবং আস্থার অনেক বড় কারণ। এরপর প্রথমে কুফরের নিন্দা এবং কাফেরদের ধর্মের প্রতি স্বীয় বিমুখতা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আরও বলেছেন যে, আমি নবী পরিবারেরই একজন এবং তাঁদেরই সত্য ধর্মের অনুসারী। আমার পিতৃপুরুষ হচ্ছেন ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব। এ বংশগত আভিজাত্যও স্বভাবতঃ মানুষের আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়। এরপর বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে খোদায়ী গুণাবলীতে অংশীদার মনে করা আমাদের জন্যে মোটেই বৈধ নয়। এ সত্য ধর্মের তওফীক আমাদের প্রতি এবং সব লোকের প্রতি আল্লাহ তাআলারই অনুগ্রহ। তিনি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দান করে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। কিন্তু অনেক লোক এ নেয়ামতের কদর ও অনুগ্রহ স্বীকার করে না। অতঃপর তিনি কয়েদীদেরকেই প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা তোমরাই বল, অনেক পালনকর্তার উপাসক হওয়া উত্তম, না এক আল্লাহর দাস হওয়া ভাল, যিনি সবার উপরে পরাক্রমশালী? অতঃপর অন্য এক পন্থায় মূর্তিপূজার অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করে বললেন : তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কিছুসংখ্যক প্রতিমাকে পালনকর্তা মনে করে নিয়েছ। এরা শুধু নামসর্বস্বই, অথচ এদেরকেই তোমরা মা'বুদ স্যাবস্ত করে নিয়েছ। ওদের মধ্যে এমন কোন সত্তাগত গুণ নেই যে, ওদেরকে সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করা যেতে পারে। কারণ, ওরা সবাই চেতনা ও অনুভূতিহীন। এটা চাক্ষুষ বিষয়। ওদের সত্য উপাস্য হওয়ার অপর একটি উপায় ছিল এই যে, আল্লাহ তাআলা ওদের আরাধনার জন্যে নির্দেশ নাযিল করতেন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বিবেকবুদ্ধি যদিও ওদের খোদায়ী স্বীকার না করত, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশের কারণে আমরা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে ছেড়ে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতাম। কিন্তু এখানে এরূপ কোন নির্দেশও নেই। কেননা, আল্লাহ তাআলা এসব কৃত্রিম উপাস্যের এবাদতের জন্যে কোন প্রমাণ কিংবা সনদও নাযিল করেননি। বরং তিনি এ কথাই বলেছেন যে, নির্দেশ ও শাসনক্ষমতার অধিকার আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নেই। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কারও এবাদত করো না। আমার পিতৃপুরুষেরা এ সত্য ধর্মই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন; কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য জানেনা।

প্রচার ও দাওয়াত সমাপ্ত করার পর ইউসুফ (আঃ) কয়েদীদের স্বপ্নের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বললেন : তোমাদের একজন তো মুক্তি পাবে এবং চাকুরীতে পুনর্বহাল হয়ে বাদশাহকে মদ্যপান করাবে। অপর জনের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শূল চড়ানো হবে। পাখীরা তার মাথার মগজ ঠুকরে খাবে।

وَاتَّبَعَتْ مَلَكَةَ آيَاتِهِ إِذْ هَبَّتْ وَرَأَتْ سَخْبًا وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ  
 لَهَا أَنْ تَشْرَكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا  
 وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَصَاحِبِي  
 السَّبْحِ وَأَرْبَابُ مُتَّفِقُونَ خَيْرًا أَمَّ اللَّهُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ ۝  
 مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَتَّابُوهَا أَنْتُمْ وَ  
 آبَاؤُكُمْ مِمَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ  
 أَمْرًا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا الْآيَةَ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَصَاحِبِي السَّبْحِ أَمَّا أَحَدُكُمْ  
 فَيَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ حَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ  
 مِنْ رَأْسِهِ فَضَى الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ سَتَّقْتَيْنِ ۝ وَقَالَ  
 لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَازِعٌ مَعَهُمَا أذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ  
 الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَمَّ فِي السَّبْحِ بِضَعِ سَيْنِينَ ۝  
 وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ  
 سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُبُلَاتٍ خَضْرَاءَ وَأَخْرَجْتُ يَا أَيُّهَا  
 الْمَلِكُ أَنْتَوْنِي فِي رُؤْيَايَ إِنَّ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ۝

(৩৮) আমি আপন পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের ধর্ম অনুসরণ করছি। আমাদের জন্য শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহর অশৌাদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না। (৩৯) হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? (৪০) তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা স্যাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ্ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য করণও এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (৪১) হে কারাগারের সঙ্গীরা! তোমাদের একজন আপন প্রভুকে মন্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শুলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখী আহ্বার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জনার আগ্রহী তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। (৪২) যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল : আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে। অতঃপর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল। (৪৩) বাদশাহ বলল : আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাডাঙ্গা গাভী—এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে পারিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা পারদর্শী হয়ে থাক।

পয়গম্বরসুলভ অনুকম্পার অভিনব দৃষ্টান্ত : ইবনে-কাসীর বলেন : উভয় কয়েদীর স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট ছিল এবং এটাও নির্দিষ্ট ছিল যে, যে ব্যক্তি বাদশাহকে মন্যপান করাত, সে মুক্ত হয়ে চাকুরীতে পুনর্বহাল হবে এবং বাবুটিকে শুলে চড়ানো হবে। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ অনুকম্পার কারণে নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, তোমাদের অমুককে শুলে চড়ানো হবে—যাতে সে এখন থেকেই চিন্তামুক্ত না হয়ে পড়ে। বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এক অপরজনকে শুলে চড়ানো হবে।

সবশেষে বলেছেন : আমি তোমাদের স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা নিছক অনুমানভিত্তিক নয় ; বরং এটাই আল্লাহর আঁল ফয়সালা। যেসব তফসীরবিদ তাদের স্বপ্নকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলেছেন, তাঁরা একথাও বলেছেন যে, ইউসুফ (আঃ) যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, তখন তারা উভয়েই বলে উঠল : আমরা কোন স্বপ্নই দেখিনি, বরং মিছামিছি বানিয়ে বলেছিলাম। তখন ইউসুফ (আঃ) বললেন : **ضَى الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ سَتَّقْتَيْنِ** তোমরা এ স্বপ্ন দেখে থাক বা না থাক, এখন বাস্তবে তাই হবে, যা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মিথ্যা স্বপ্ন তৈরী করার যে গোনাহ করেছ এখন তার শাস্তি তা'ই, যা ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে রেহাই পাবে, তাকে ইউসুফ (আঃ) বললেন : যখন ভূমি মুক্ত হয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে পৌছবে, তখন বাদশাহর কাছে আমার বিষয়েও আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে পড়ে রয়েছে। কিন্তু মুক্ত হয়ে লোকটি ইউসুফ (আঃ)—এর কথা ভুলে গেল। ফলে ইউসুফ (আঃ)—এর মুক্তি আরও বিলম্বিত হয়ে গেল এবং এ ঘটনার পর আরও কয়েক বছর তাঁকে কারাগারে কাটাতে হল। আয়াতে **بِضَعِ سَيْنِينَ** কা হয়েছে। শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বোঝায়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এ ঘটনার পর আরও সাত বছর তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে।



قَالُوا أَضَلُّتُمْ أَضَلُّتُمْ وَمَا تَعْنُونَ بِتِلْكَ الْكَلِمَاتِ الْعِظِيمِ  
 وَقَالَ الَّذِي نَجَّيْنَاهُمَا وَذَكَرَ يُعَبِّدُ أَنَا أَنِّي كُنْتُ يُرَى  
 فَأَرْسَلُونَهُ ۖ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَانِي فَمَنْ بَكَرِيتِ  
 وَسَمَانِ يَا أَيُّهَا سَمِعَ عَجَابًا وَسَمِعَ سُنْبُلَاتٍ خَضِرًا وَاعْرَ  
 يُبْسِتُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ رَزَعُونَ  
 سَمِعَ سِينِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلَةٍ لَّا قَلِيلًا  
 وَمِنَّا لَكَاؤُنَّ ۖ ثُمَّ بَدِيءُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَمِعَ شِدَادًا لَكُنَّ مَا  
 قَدَّمَ لَهُنَّ الْوَالِدَ كَمَا تَخْتَصِمُونَ ۖ ثُمَّ بَدِيءُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
 عَامَ وَفِيهِ نِعَاتُ النَّاسِ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۖ وَقَالَ الْمَلِكُ الْتَمَوْنَ  
 يَهُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ مَا بَالُ  
 الْمَيْمُونَةِ الَّتِي قَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ  
 قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَوْتُمْ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ  
 لَنَا مَا حَبَلْنَا عَلَيْهِمْ مِن سَوْءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ لَنْ يَخْصَصَ  
 الْحَقُّ أَنَا رَأَوْتُهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصِّدِّيقِينَ ۖ ذَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ  
 آتَى لَكُمْ أَخْتَهُ بِالْغَيْبِ ۖ وَإِنَّ لَلكلَّ لَيَهْدِي وَيُبَيِّنُ لِّلْمُحْسِنِينَ ۖ

(৪৪) তারা বলল : এটা কল্পনামূলক স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জন্য নেই। (৪৫) দু' জন কারাকান্ডের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর স্মরণ হলো, সে বলল, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলছি। তোমরা আমাকে ধারণ কর। (৪৬) সে তথ্যই পৌঁছে বলল : হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাভাজা গাভী—তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক, আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে পশনির্দেশ প্রদান করুন : যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করতে পারি। (৪৭) বলল : তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সমেত রেখে দেবে। (৪৮) এবং এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর; তোমরা এ দিনের জন্য যা রেখেছিল, তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে। (৪৯) এরপরেই আসবে একবছর — এতে মানুষের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং এতে তারা রস নিঃসৃতাবে। (৫০) বাদশাহ বলল : ফিরে যাও তোমাদের প্রভুর কাছে এবং জিজ্ঞাস কর তাঁকে : এ খিল্লার স্বরূপ কি, যারা স্বীয় হস্ত কর্তন করেছিল। আমার পালনকর্তা তো তাদের ছলনা সবই জানেন। (৫১) বাদশাহ মহিলাদেরকে বললেন : তোমাদের ফল-হাসিকি-কত কি, যখন তোমরা ইউসুফকে আত্মসংবরণ থেকে ফুলিয়েছিলে? তারা বলল : আল্লাহ্ মহান, আমরা তার সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না। আযীয-পত্নি বলল : এখন সত্য কথা প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাকে আত্মসংবরণ থেকে ফুলিয়েছিলাম এবং সে সত্যবাদী। (৫২) ইউসুফ বললেন : এটা এজ্ঞা, যাতে আযীয জেনে নেয় যে, আমি গোপনে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আরও এই যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে এগুতে দেন না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-এর মুক্তির জন্যে অদৃশ যবনিকার অন্তরাল থেকে একটি উপায় সৃষ্টি করলেন। বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখে উদ্বেগাকুল হলেন এবং রাজ্যের জ্ঞানী ব্যাখ্যা ও অতীন্দ্রিয়-বাদীদেরকে একত্রিত করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাস করলেন। স্বপ্নটি কারও বোধগম্য হল না। তাই সবাই উত্তর দিল :

أَضَلُّتُمْ أَضَلُّتُمْ وَمَا تَعْنُونَ بِتِلْكَ الْكَلِمَاتِ الْعِظِيمِ এখানে শব্দটি স্ফটক এর বহুবচন। এর অর্থ এমন গুঁটলী, যাতে বিভিন্ন প্রকার আবর্জনা ও ঘাসখড় জমা থাকে। অর্থ এই যে, এ স্বপ্নটি মিশ্র ধরনের। এতে কল্পনা ইত্যাদি शामिल রয়েছে। আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না। সঠিক স্বপ্ন হলে ব্যাখ্যা দিতে পারতাম।

এ ঘটনা দেখে দীর্ঘকাল পর ইউসুফ (আঃ)-এর কথা মুক্তিপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর মনে পড়ল। সে অগ্রসর হয়ে বলল : আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব। তখন সে ইউসুফ (আঃ)-এর গুণাবলী, স্বপ্ন ব্যাখ্যা পারদর্শিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করে অনুরোধ করল যে, তাকে কারাগারে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হোক। বাদশাহ এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন এবং সে ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হল। কোরআন-পাক এসব ঘটনা একটিমাত্র শব্দ فَأَرْسَلُونَهُ দ্বারা বর্ণনা করেছে। এর অর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিন। ইউসুফ (আঃ)-এর নামোল্লেখ, সরকারী মঞ্জুরী অতঃপর কারাগারে পৌঁছা এসব ঘটনা আপনি আপনি বোঝা যায়। তাই এগুলো পরিষ্কার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে

করা হয়নি; বরং এ বর্ণনা শুরু করা হয়েছে : يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ অর্থাৎ লোকটি কারাগারে পৌঁছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে ইউসুফ (আঃ)-এর صديق অর্থাৎ কথা ও কাজে সাক্ষা হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। অতঃপর দরখাস্ত করেছে যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। স্বপ্ন এই যে, বাদশাহ সাতটি মোটাভাজা গাভী দেখেছেন। এগুলোকেই অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও সাতটি গমের সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ দেখেছেন।

لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ অর্থাৎ, আপনি ব্যাখ্যা বলে দিলে অচিরেই আমি ফিরে যাব এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা বর্ণনা করব। এতে সম্ভবতঃ তারা আপনার জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে অবগত হবে।

তফসীরে-মায়হারীতে বলা হয়েছে, 'আলমে-মিসালা' তথা প্রত্যাকৃতি-জগতে ঘটনাবলী যে আকারে থাকে, স্বপ্নে তাই দৃষ্টিগোচর হয়। এ জগতের প্রত্যাকৃতিসমূহের বিশেষ অর্থ আছে। স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্র পুরোপুরিই এসব অর্থ জানার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-কে এ শাস্ত্র পুরোপুরি শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি স্বপ্নের বিবরণ শুনে বোঝে নিলেন যে, সাতটি মোটাভাজা গাভী ও সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলনসম্পন্ন সাত বছর। কেননা, মৃত্তিকা চষায় ও ফসল ফলানোর কাজে গাভীর বিশেষ ভূমিকা থাকে। এমনিভাবে সাতটি শীর্ণ গাভী ও সাতটি শুষ্ক শীষের অর্থ হচ্ছে, প্রথম সাতটি গাভীকে খেয়ে ফেলার অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী সাত বছরে খাদ্যশস্যের যে ভান্ডার সঞ্চিত থাকবে, তা সবই দুর্ভিক্ষের সাত বছর নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুষ্ক বীজের জন্যে কিছু খাদ্যশস্য বেঁচে যাবে।

বাদশাহর স্বপ্নে বাহ্যতঃ এতটুকুই ছিল যে, সাত বছর ভাল ফলন হবে, এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) আরও কিছু বাড়িয়ে বললেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এক বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। এ বিষয়টি ইউসুফ (আঃ) এভাবে জানতে পারেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর যখন সর্বমোট সাতটি, তখন আল্লাহর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অষ্টম বছর বৃষ্টিপাত ও উৎপাদন হবে। হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা হওয়ার মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ) কে এ বিষয়ে জ্ঞাত করিয়েছিলেন, যাতে স্বপ্নের ব্যাখার অতিরিক্ত কিছু সৎবাদ তারা লাভ করে, তাঁর জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ পায় এবং তাঁর মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তদুপরি ইউসুফ (আঃ) শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি ; বরং এর সাথে একটি অভিজ্ঞনোচিত ও সহনুভূতিমূলক পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, প্রথম সাত বছরে সে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবেন, তা গমের শীষের মধ্যেই সংরক্ষিত রাখতে হবে — যাতে পুরানো হওয়ার পর গমে পোকা না লাগে — অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোকা লাগে না।

كُلُّ يَوْمٍ تَكُونُ فِيهِ لِطَوَائِفٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ অর্থাৎ, প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ খরা ও দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে এবং পূর্ব-সম্মিত শস্য ভান্ডার খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, শীর্ণ ও দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা ও শক্তিশালী গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলছে। তাই ব্যাখ্যা এর সাথে মিল রেখে বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষের বছরগুলো পূর্ববর্তী বছরগুলোর সম্মিত শস্য ভান্ডার খেয়ে ফেলবে ; যদিও বছর এমন কোন বস্তু নয়, যা কোনকিছুকে ভক্ষণ করতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জীব-জন্তুতে দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে পূর্ব-সম্মিত শস্য ভান্ডার খেয়ে ফেলবে।

কাহিনীর গতিধারা দেখে বোঝা যায় যে, এ ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে এসেছে এবং বাদশাহকে তা অবহিত করেছে। বাদশাহ বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চিন্ত ও ইউসুফ (আঃ) এর গুণ গরিমায় মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কোরআন পাক এসব বিষয় উল্লেখ করা দরকার মনে করেনি। কারণ, এগুলো আপনা থেকেই বোঝা যায়। পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُوحِيهِ ۚ অর্থাৎ, বাদশাহ আদেশ দিলেন যে, ইউসুফ

(আঃ) কে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এস। অতঃপর বাদশাহর জনৈক দূত এ বার্তা নিয়ে কারাগারে পৌঁছল।

ইউসুফ (আঃ) দীর্ঘ বন্দীজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশাহর প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তা অন্যের পক্ষে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়।

তিনি দূতকে উত্তর দিলেন :

قَالَ اسْرِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَلَّهُ مَا يَأْتِيكَ الْيَسُورَةُ الْاُولَىٰ فَظَنَّ اَيُّهَا يَوْمَئِذٍ  
اِنَّ رَبِّيَ لَبَكِيٍّ عَلِيمٌ

অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) দূতকে বললেন : তুমি বাদশাহর কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস কর যে, আপনার মতে ঐ মহিলাদের ব্যাপারটি কিরূপ, যারা হাত কেটে ফেলেছিল? বাদশাহ এ ব্যাপারে আমাকে সম্বন্ধ করেন কি না এবং আমাকে দোষী মনে করেন কি না?

এখানে এ বিষয়টিও প্রাধান্যযোগ্য যে, ইউসুফ (আঃ) এখানে হস্তকর্তনকারিণী মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন, আযীয-পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি ; অথচ সেই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। বলাবাহুল্য, এতে ঐ নিমকের কদর করা হয়েছে, যা ইউসুফ (আঃ) আযীযের গৃহে লালিত পালিত হয়ে খেয়েছিলেন। প্রকৃত ভদ্র স্বভাবের লোকেরা স্বভাবতই এরূপ নিমকহালানী করার চেষ্টা করে থাকেন।—(কুরতুবী)

আরেক কারণ এই যে, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। এ মহিলাদের মাধ্যমেও এ উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারত এবং এতে তাদেরও তেমন কোন অপমান ছিল না। তারা সত্য কথা স্বীকার করলে শুধু পরামর্শ দানের দোষ তাদের ঘাড়ে চাপত। আযীয-পত্নীর অবস্থা এরূপ ছিল না। সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তাকে ঘিরেই তদন্তকার্য অনুষ্ঠিত হত। ফলে তার অপমান বেশী হত। ইউসুফ (আঃ) সাথে সাথে আরও বললেন : اِنَّ رَبِّيَ لَبَكِيٍّ عَلِيمٌ অর্থাৎ, আমার পালনকর্তা তো তাদের মিথ্যা ও ছল-চাতুরী অবহিতই রয়েছে। আমি চাই যে, বাদশাহও বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হোন। এ বাক্যে সুস্থ ভঙ্গিতে নিজের পবিত্রতাও বর্ণিত হয়েছে।